বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

াঙ্ক	প্রদানের তাবিথ	গ্রহণেব তাবিথ	পত্রাঙ্ক	প্রদানেব তারিখ	গ্রহণেব তাবিথ
২	১২/১১	[illegible]			
[illegible]		১২/১২			
[illegible]	২১/৭				

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানে[illegible] তারি[illegible]

পূজ্যপাদ

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের

স্বরচিত জীবন-চরিত।

ও

পরিশিষ্ট।

শ্রীপ্রিয় নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৯।৬ ছকু খানসামার লেন, কলিকাতা।

Calcutta:
PRINTED BY
J N BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS
119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD.

1898.

 [মূল্য ১॥০ টাকা।

ঞী ২৭৩

বিজ্ঞাপন।

স্বরচিত জীবন-চরিতের ১০৩ পৃষ্ঠাতে এই যে লিখিত আছে, "উপনিষদে আছে যে, যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি, তাহার শ্রুতিপ্রমাণ এই—

"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবতি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। ৩॥ মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। ৪॥ তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহি যবা ওষধি বনস্পতযস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" ॥ ৬ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

৫ প্রপাঠক।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৬	৩	স্বরণ	স্মরণ
১৬	৮	পুষ্করিনীর	পুষ্করিণীর
৪২	১৫	সতে সতে	সতে

ওঁ

ভূমিকা।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইল। ইহাতে তাঁহার বাল্যেই ধর্ম্মানুরাগ, তাঁহার বৈরাগ্য, উপনিষদ্ শিক্ষা, ব্রাহ্মসমাজে যোগ ও সমাজ গঠন, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ণ, সাধন, পরলোক ও মুক্তি এবং শিমলা ভ্রমণাদি অনেক বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই তাঁহার পরিপূর্ণ জীবন-চরিত নহে। তাঁহার জীবন-চরিত অগাধ ও অসাধারণ। আমার সহিত তাঁহার বহু দিনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৮০১ শক হইতে তাঁহার শিষ্যত্ব ও পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা গ্রন্থ শেষে পরিশিষ্টে আমি বর্ণন করিলাম। মধ্য কালের বৃত্তান্ত যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা তাঁহার মুখে যতদূর শুনিয়াছি ও অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হইতেছি তাহা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রার্থনা করি যে ঈশ্বরের কৃপা আমার এই ইচ্ছার উপরে অবতীর্ণ হউক।

শ্রীপ্রিয় নাথ শাস্ত্রী।

গ্রন্থ-স্বত্বাধিকার।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রিয় নাথ !

১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমার জীবন-কাহিনী ঊনচল্লিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করিয়া তোমাকে দিলাম; ইহা তোমার সম্পত্তি হইল। ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দু বিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না। আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না, তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, ইহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিবে। তোমার মঙ্গল হউক। ইতি ১১ই মাঘ ১৮১৬ শক।

পুনশ্চ—ইহার ইংরাজী অনুবাদের অধিকার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ ও শ্রীমান্ রবীন্দ্র নাথকে দিলাম। অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের অধিকার তোমারই রহিল। ইতি ১১ই মাঘ ১৮১৬ শক।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ওঁ শ্রী হরি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিদিমা * আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন, পবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে াাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম। ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন। এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত র্য্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও ে য়ে ছাতের উপরে রৌদ্রেতে হার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং সেই সূর্য্য অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া িয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল। "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং তিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং"। দিদিমা ক দিন হরিবাসর করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং ন হইত; তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারি- । তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন এবং স্বহস্তে র্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে

* আমার পিতামহী।

তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না। তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্য্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল, এবং ধর্ম্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি মা-গোসাঁইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল। আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাড়ীতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শনার্থে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভাল বাসিতাম না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া শান্ত-ভাবে সমস্ত দেখিতাম। এখন আমার দিদিমা আর নাই। কিন্তু, কতদিন পরে, কত অন্বেষণের পরে, আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি। দিদিমা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে বলেন, আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আ কাহাকেও দিব না, তোমাকেই দিব। পরে তিনি তাঁহার বাক্সে চাবিটা আমাকে দেন। আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাকা ও মোহর পাইলাম, লোককে বলিলাম যে, আমি মুড়ি মুড়কি পাইয়াছি। ১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে "যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস্ নে।" কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল তখন তিনি কহিলেন, "তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে

গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোরদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।” গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, “এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।” বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল, মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্দ্ধমুখে আছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন "ঐ ঈশ্বর ও পরকাল।" দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।

মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পুঁতিয়া আসিলাম। এই কয় দিন খুব গোঁলোযোগে কাটিয়া গেল। পরে, দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা পাইবার জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে কেবলই ঔদাস্য আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ঔদাস্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখন সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। এস্থলে ভাগবতের একটি উপাখ্যানের সহিত আমার অবস্থার তুলনা হইতে পারে।

নারদ বেদব্যাসের নিকটে আপনার কথা বলিতেছেন—"আমি পূর্ব্বজন্মে কোন এক ঋষির দাসীপুত্র ছিলাম। ঐ ঋষির আশ্রমে বর্ষার কয়েক মাস অনেক সাধুলোক আশ্রয় লইতেন। আমি তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতাম। ক্রমশঃ আমার দিব্য-জ্ঞান জন্মিল এবং মনে হরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল। পরে ঐ সমস্ত সাধু আশ্রম হইতে বিদায় লইবার কালে কৃপা করিয়া আমাকে জ্ঞান-রহস্য শিক্ষা দিয়া যান। ইহার দ্বারা আমি হরি-মাহাত্ম্য সুস্পষ্ট জানিতে পারি। জননী ঋষির দাসী, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। "একাত্মজা মে জননী।" আমি কেবল তাঁহারই জন্য ঐ ঋষির আশ্রম ত্যাগ করিতে পারি নাই। একদা তিনি নিশাকালে গো-দোহন করিবার জন্য বাহিরে যান। পথে একটি কৃষ্ণসর্প পাদ-স্পৃষ্ট হইবা মাত্র তাঁহাকে দংশন করে এবং তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইটি আমি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির বড় সুযোগ মনে করিলাম এবং একাকী ঝিল্লিকাগণনাদিত এক ভীষণ মহাবনে প্রবেশ করিলাম। পর্য্যটন শ্রমে আমার অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা হইয়াছিল।

আমি এক সরোবরে স্নান ও জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। মন প্রশান্ত হইল। অনন্তর আমি এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলাম এবং সাধুগণের উপদেশ অনুসারে আত্মস্থ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন ভাবে আপ্লুত, নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। সহসা হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। আমি যারপর নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই শোকাপহ কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আর পাইলাম না। তখন আতুরের ন্যায় অতৃপ্ত হইয়া পড়িলাম, ইত্যবসরে সহসা এক দৈববাণী হইল—'এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের চিত্তের মল ক্ষালিত হয় নাই, যাহারা যোগে অসিদ্ধ, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে একবার তোমাকে দেখা দিলাম, ইহা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য।"

আমার ঠিক এইরূপই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আমি সেই রাত্রিকালের আনন্দ না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আবার আমার অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দিল। কেবল নারদের এই উপাখ্যানের সঙ্গে আমার একটি বিষয়ে মিল হয় না। তিনি প্রথমে ঋষিদিগের মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস

আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাশক্তি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিদিমার মৃত্যুর পর এক দিন আমার বৈঠক খানায় বসিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে, আজ আমি কল্পতরু হইলাম। আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা কিছু চাহিবে, তাহাকে আমি তাহাই দিব। আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার জেষ্ঠতাত পুত্র ব্রজ বাবু বলিলেন যে, আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দি'ন, ঐ ছবিগুলান দি'ন, ঐ জরির পোষাক দি'ন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সকলই দিলাম। তিনি পরদিন মুটে আনিয়া বৈঠক খানার সমস্ত জিনিস লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল, আর আর বহুমূল্য গৃহ-সজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন। এইরূপে আমার সকল আস্‌বাব বিলাইলাম। কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ, সেই বিষাদ, তাহা আর ঘুচে না। কিসে শান্তি পাইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক এক দিন কৌচে পড়িয়া ঈশ্বর বিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কৌচ হইতে উঠিয়া, ভোজন করিয়া, আবার কৌচে কখন পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না—আমার বোধ হইতেছিল, যেন আমি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটি খুব নির্জ্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধি-স্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী [illegible] তুল্য। কিছুতেই সুখ নাই. কিছুতেই শান্তি নাই

তুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল—"হবে, কি হবে দিবা আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" এই আমার প্রথম গান। আমি সেই সমাধি স্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটি মুক্তকণ্ঠে গাইতাম। তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বালক-কালাবধিই অনুরাগ চাণক্যের শ্লোক যত্নপূর্ব্বক তখন মুখস্থ করিতাম। কোন ভাল শ্লোক শুনিলে অমনি তাহা শিখিয়া লইতাম। তখন ার বাটীতে একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম ান্ত চূড়ামণি, নিবাস বাঁশবেড়ে। তিনি অগ্রে মোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন। পরে আমাদের হন। ুপণ্ডিত ও তেজস্বী, আমার বয়স তখন অল্প, তিনি আমাকে ল বাসিতেন। আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। একদিন ম, আমি আপনার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িব। তিনি ান, ভালই তো, আমি তোমাকে পড়াইব। তখন চূড়ামণির মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলাম এবং ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব, করিতে লাগিলাম। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ হইবার জন্য, ণির নিকট আমার মুগ্ধবোধ পড়িবার প্রথম উৎসাহ। এক-ড়ামণি তাঁহার হাতের লেখা একখানি কাগজ আস্তে আস্তে করিয়া আমার হাতে দিলেন, কহিলেন, এই লেখাতে সহি দেও। আমি বলিলাম কি লেখা? পড়িয়া দেখি, তাহাতে আছে যে, তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতি- করিতে হইবে। আমি তাহাতে তখনি সহি করিয়া দিলাম। চূড়ামণির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল, তিনি বলিলেন আর আমি অমনি তাহাতে সহি করিয়া দিলাম। তাহার বিষয় আমি তখন কিছুই প্রণিধান করিলাম না। কিছুদিন পরে আমাদের

সভাপণ্ডিত চূড়ামণির মৃত্যু হইল। তখন শ্যামাচরণ আমার সেই স্বাক্ষর টুকু লইয়া আমার নিকট আসিলেন, কহিলেন যে, "আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়, এখন আপনার আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দেখুন আপনি পূর্ব্বেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন।" আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলাম এবং তদবধি শ্যামাচরণ আমার নিকটে থাকিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈশ্বরের তত্ত্বকথা কিসে পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, মহাভারতে। তখন আমি তাঁহার নিকট মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটি শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। তাহা এই—"ধর্ম্মে মতির্ভবতুবঃ সততোত্থিতানাং সহ্যেকএব পরলোক-গতস্য বন্ধুঃ।" "অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা নৈবাপ্ত-ভাবমুপয়ন্তি ন চ স্থিরত্বং" তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, তোমরা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত হও, সেই এক ধর্ম্মই পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু। অর্থ, স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেবা করিলেও তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যায় না এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই। মহা-ভারতের এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল। আমার সংস্কার ছিল যে, সকল ভাষাতেই বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষার ন্যায়, বিশেষ্যের অগ্রে বিশেষণগুলি থাকে; কিন্তু সংস্কৃতে দেখি-লাম যে, বিশেষ্য এখানে, বিশেষণ সেই সেখানে। এইটি আয়ত্ত করিতে আমার কিছুদিন লাগিয়াছিল। আমি এই মহাভারতের অনেক অংশ পাঠ করি। ধৌম্য ঋষির উপাখ্যানে উপমন্যুর গুরু-ভক্তির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। এখন তো ঐ বৃহৎ গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া অনেকের পাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু তখনকার কালে ঐ মূলগ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিত। আমি ধর্ম্ম পিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি। একদিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত,

তেমনি অপরদিকে ইংরাজী। আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব সেই অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্ব্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি স্পর্শমাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ? আবার ভাবিলাম, যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্য্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর একটা অবভাস হয়, ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে? য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল। কিন্তু একজন নাস্তিকের নিকট এই টুকুই যথেষ্ট। সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু আমি ইহাতে কিরূপে তৃপ্ত হইব? আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য—অন্ধবিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বাড়িতে লাগিল, এক একবার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত আমি যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়-জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে এই আলোক টুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি, ইহা বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন পোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না—চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনা-বান পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্যপান করে, ইহা কে তাহাকে শিখাইয়া দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল,

তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

বহুপূর্ব্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল, আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম, বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা। তিনি অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাঁহার কোন অবয়ব নাই। তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই। কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনি কালীঘাটের কালীও নহেন—তিনি আমাদের বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। এইখানেই পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। সৃষ্টির কৌশল-চিন্তায় স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয় পাই। নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া বুঝি তিনি অনন্ত। এই সূত্র টুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্তজ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি, তিনি তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনা কর্ত্তা নহেন, তাহা হইতে উচ্চ, তিনি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই সৃষ্ট বস্তু সকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্ত্তনশীল ও পরতন্ত্র। ইহাদিগকে যে পূর্ণজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত্র। সেই নিত্য সত্য পূর্ণ পুরুষ সকল মঙ্গলের হেতু এবং সকলের সম্ভজনীয়। কতদিন ধরিয়া এইটি আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি দুর্গম পথ, এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহাতে সায় দেয় কে? কিরূপ সায়? যেমন পদ্মার মাঝীর নিকট হইতে আমি একটা সায় পাইয়াছিলাম, সেইরূপ সায়।

আমি একবার জমীদারী কালীগ্রামে যাই। অনেক দিনের পর বাড়ীতে ফিরি। আমি পদ্মার উপর বোটে। তখন বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘনঘটা, বেগে বায়ু উঠিয়াছে। পদ্মা তোলপাড় হইতেছে, মাঝীরা ভারি তুফান দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, কিনারায় বোট বাঁধিয়া ফেলিল। সেই কিনারাতেও তরঙ্গে বোট স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহুদিন বিদেশে, শীঘ্র বাড়ীতে আসিতে বড় ইচ্ছা। বেলা ৪ চারিটার সময়ে একটু বাতাস কমিলে আমি মাঝীকে বলিলাম যে, এখন নৌকা ছাড়িতে পারিবি? সে বলিল, "হুজুরের হুকুম হয় তো পারি।" আমি মাঝীকে বলিলাম, তবে ছাড়্। তার পর দেখি সময় চলিয়া যায়, তবু নৌকা ছাড়ে না। আধ ঘণ্টা হইয়া গেল তবু ছাড়ে না। মাঝীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুই যে বল্লি, হুজুরের হুকুম হইলে নৌকা ছাড়িয়া দিতে পারি, আমি তো হুকুম দিয়াছি, তবে এখনও ছাড়িলি না কেন? এখন একটু ঝড় থেমেছে, আবার কখন্ ঝড় উঠিবে, তাহার ঠিক নাই। যদি ছাড়িতে হয় তো এখনি ছাড়। সে বলিল যে, বৃদ্ধ দেয়ানজী বলিলেন—"ওরে মাঝি, এমন কর্ম্ম কি করিতে হয়? একে এই সর্‌দার মোহানা, কূলকিনারা কিছুই দেখা যায় না, তাহাতে শ্রাবণের সংক্রান্তি। ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা কিনারাতেই থাকিতে পারিতেছে না। তুই কিনা এই অবেলায় এহেন পদ্মায় পাড়ি দিতে চাস?" দেয়ানজীর এই কথায় ভয় পেয়ে আমি নৌকা ছাড়িতে পারি নাই। আমি বলিলাম ছাড়। সে অমনি নৌকা খুলে পাইল তুলে দিলে।

অমনি বাতাসের এক ধাক্কায় নৌকা পদ্মার মধ্যে চলিয়া গেল। হাজার নৌকা কিনারায় বাঁধা ছিল, তাহারা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল—এখন যাবেন না, যাবেন না। তখন আমার হৃদয় ডুবিয়া গেল। কি করি আর ফিরিবার উপায় নাই—নৌকা পাইল পাইয়া শাঁ শাঁ করিয়া চলিতে লাগিল। খানিক গিয়া দেখি যে তরঙ্গে তরঙ্গে জল ফাঁপিয়া সম্মুখে যেন একটা দেওয়াল উঠিয়াছে। নৌকা তাহাকে ভেদ করিতে ছুটিল, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। এমন সময়ে অদূরে দেখি, এক খানা ডিঙ্গি হাবু ডুবু খাইতে খাইতে মোচার খোলার মত ওপার হইতে আসিতেছে। তাহার মাঝী আমাদের সাহস দেখিয়া সাহস দিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"ভয় নাই চলে যান"। আমার উৎসাহে উৎসাহর স্বর মিশাইয়া এমন ভরসা দেয় কে? আমি এইরূপ সায় চাই। কিন্তু হা! তা আর কে দিবে?।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রাম মোহন রায়কে স্মরণ হইল—আমার চেতন হইল, আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।

শৈশব কাল অবধি আমার রাম মোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কালেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রাম মোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিনীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রাম মোহন রায়ের মানিক তলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রৌদ্রে হুটা পাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালিকে বলিলেন, যা, গাছথেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গ চালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন ব্রাদার! এখন তুমি টান।

আমি পিতার জেষ্ঠ পুত্র। কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকেই বাড়ী বাড়ী যাইতে হইত। আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রাম মোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া বলিলাম—রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, ব্রাদার! আমাকে কেন? রাধা প্রসাদকে বল। এত দিন পরে সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রাম মোহন রায় যেমন কোন প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না; কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার এই সংকল্প দৃঢ় হইল। তখন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ করিলাম।

আমার ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া সংকল্প করিলাম যে, পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই যাইব না, যদি কেহ যাই তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না। তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময় আমার পিতা দালানে যাইতেন। সুতরাং তাঁহার ভয়ে আমাদেরও তখন সেখানে যাইতে হইত। কিন্তু প্রণামের সময় যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত, আমরা তখন দাঁড়াইয়া থাকিতাম—আমরা প্রণাম করিলাম কি না কেহই দেখিতে পাইত না।

যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই-প্রকার নিরাশ ভাব, তখন হঠাৎ এক দিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা

পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্য বশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের কর্ম্ম সারিয়া শীঘ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, তুমি ইহার মধ্যে এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাখ, কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে। এই বলিয়া আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতাম। আমার ছোট কাকা রমা নাথ ঠাকুর তাহার ধন রক্ষক। আমি তাঁহার সহকারী। ১০ টা হইতে যতক্ষণ না কাজ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সে দিন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পুঁথির পাতা বুঝিয়া লইতে হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহ্য হইল না। আমি ছোট কাকাকে বলিয়া কহিয়া দিন থাকিতে থাকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আমার বৈঠক খানার তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে, আমাকে বুঝাইয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ইংরাজ পণ্ডিতেরা তো ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে? তিনি বলিলেন, এ তো সব ব্রহ্ম-সভার কথা—ব্রহ্ম-সভার রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বুঝিতে পারেন। আমি বলিলাম তবে তাঁহাকে ডাক। বিদ্যাবাগীশ খানিক পরেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা

পড়িয়া বলিলেন, এ যে ঈশোপনিষৎ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য সিদ্ধনং।" যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল—আমার আকাঙ্খা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে "ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।" ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে অচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি এমন সায় দিতে পারে? সেই ঈশ্বরেরই করুণা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, তাই "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই গূঢ় বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। আহা! কি কথাই শুনিলাম—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক। কেবল তাঁহাকে লইয়া থাকা মানুষের ভাগ্যে কি মহৎ কল্যাণ। আমি চির দিন যাহা চাহিতেছি ইহা তাহাই বলে।

আমার বিষাদের যে তীব্রতা, তাহা এই জন্য ছিল যে, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকলপ্রকার সুখ হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সংসারেও আমার কোনপ্রকার সুখ ছিল না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু যখন এই দৈববাণী

আমাকে বলিল যে, সকলপ্রকার সাংসারিক সুখ ভোগের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকেই ভোগ কর, তখন, আমি যাহা চাহিতেছিলাম তাহা পাইয়া আনন্দে একেবারে নিমগ্ন হইলাম। এ আমার নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ। সে ঋষি কি ধন্য যাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল। ঈশ্বরের উপরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আমি সাংসারিক সুখের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইলাম। আহা, সে দিন আমার পক্ষে কি শুভদিন—কি পবিত্র আনন্দের দিন। উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার নিকট সকল গূঢ় অর্থ ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমি বিদ্যাবাগীশের নিকট ক্রমে ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য উপনিষৎ পাঠ করি এবং অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে অবশিষ্ট আর ছয় উপনিষৎ পাঠ করি। প্রতিদিন যাহা পড়ি, তাহা অমনি কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার পর দিন বিদ্যাবাগীশকে শুনাইয়া দেই। তিনি আমার বেদের উচ্চারণ শুনিয়া বলিতেন যে, "তুমি এ উচ্চারণ কার কাছে শিখিলে? আমরা তো এ প্রকার উচ্চারণ করিতে পারি না।" আমি বেদের উচ্চারণ এক জন দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট শিখি। যখন উপনিষদে আমার বিশেষ প্রবেশ হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। প্রথমে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং ভ্রাতাদিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলাম। আমাদের বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে একটা ছোট কুঠরী চূণকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। এদিকে দুর্গা পূজার কল্প আরম্ভ হইল। আমাদের বাটীর আর সকলে এই উৎসবে

মাতিলেন। আমরা কি শূন্য-হৃদয় হইয়া থাকিব? আমরা সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে আমাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিয়া একটি সভা স্থাপন করিলাম। আমরা সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধসত্ব হইয়া পুষ্করিণীর ধারে সেই পরিষ্কৃত কুঠরীতে আসিয়া বসিলাম। আমি যেই সকলকে লইয়া সেখানে বসিলাম, অমনি যেন শ্রদ্ধা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সকলের মুখের পানে তাকাইয়া দেখি, সকলের মুখেই শ্রদ্ধার রেখা। ঘরের মধ্যে পবিত্রতার ভাবে পূর্ণ। আমি ভক্তিভরে ঈশ্বরকে আহ্বান করিয়া কঠোপনিষদের এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিলাম। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকোনাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে।" "প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্ব্বোধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে পরলোক নাই—যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে অর্থাৎ মৃত্যুর বশে আইসে।" আমার ব্যাখ্যান সকলেই পবিত্রভাবে স্তব্ধভাবে শ্রবণ করিলেন। এই আমার প্রথম ব্যাখ্যান। ব্যাখ্যান শেষ হইয়া গেলে, আমি প্রস্তাব করিলাম যে, এই সভার নাম "তত্ত্বরঞ্জিনী" হউক এবং ইহা চিরস্থায়িনী হউক। ইহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ এই সভার উদ্দেশ্য হইল। প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সায়ংকালে এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হইল। দ্বিতীয় অধিবেশনে রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই সভার আচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি এই সভার তত্ত্বরঞ্জিনী নামের পরিবর্ত্তে "তত্ত্ববোধিনী" নাম রাখেন। এইরূপে ১৭৬১ শকে ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম—বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না। প্রথম দিনে ইহার সভ্য দশ জন মাত্র ছিল। ক্রমশঃ ইহার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অগ্রে ইহার অধিবেশন আমার বাড়ীর নীচেকার একতালার একটি প্রশস্ত ঘরে হইত, কিন্তু পরে ইহার জন্য স্থকিয়া ষ্ট্রীটেতে একটি বাড়ী ভাড়া করি। সেই বাড়ী বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত কালী কৃষ্ণ ঠাকুরের অধিকারে আছে। এই সময় অক্ষয় কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ইহাঁকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। সভার অধিবেশন মাসের প্রথম রবিবারে রাত্রিকালে হইত, রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভায় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতেন। তিনি এই শ্লোকটি প্রতিবারই পাঠ করিতেন। "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং। স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা। ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥" "হে অখিলগুরো! তুমি রূপ-বিবর্জ্জিত অথচ ধ্যানের দ্বারা আমি তোমার রূপ যে বর্ণন করিয়াছি এবং স্তুতির দ্বারা তোমার যে অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার ব্যাপিত্বকে যে বিনাশ করিয়াছি; হে জগদীশ! চিত্তবিকলতা হেতু আমি যে এই তিন দোষ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর।" এই সভাতে সকল সভ্যেরই বক্তৃতা করিবার

অধিকার ছিল, তবে এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই ছিল, যিনি সকলের অগ্রে বক্তৃতা লিখিয়া সম্পাদকের হস্তে দিতেন তিনিই বক্তৃতা পাঠ করিতে পাইতেন। এই নিয়ম থাকাতে কেহ কেহ সম্পাদকের শয্যার বালিশের নীচে বক্তৃতা রাখিয়া আসিতেন। অভিপ্রায় এই যে, সম্পাদক প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাঁহার বক্তৃতা পাইবেন। তৃতীয় বৎসরে এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াছিল। এই তত্ত্ব-বোধিনী সভার দুই বৎসর চলিয়া গেল, লোকের সংখ্যা আমার মনের মত হয় না, আর একটা সভা যে হইয়াছে তাহা ভাল প্রকাশও হয় না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমে ক্রমে, ১৭৬৩ শকের ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী আসিল। এই সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এইবার একটা খুব জাঁকের সহিত সভা করিয়া সকলকে তাহা জানাইয়া দিতে আমার ইচ্ছা হইল। তখন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলে সংবাদ বড় প্রচার হইত না। অতএব আমি করিলাম কি না, কলিকাতায় যত আফিস ও কার্য্যালয় আছে, সকল আফিসের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নামে নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। কর্ম্মচারীরা আফিসে আসিয়া দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকের ডেক্‌সের উপর আপন আপন নামের এক এক খানা পত্র রহিয়াছে—খুলিয়া দেখে, তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভার নিমন্ত্রণ। তাহারা কখন তত্ত্ববোধিনী সভার নামও শুনে নাই। আমরা এ দিকে সারাদিন ব্যস্ত। কেমন করিয়া সভার ঘর ভাল সাজান হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ করিবেন, তাহারই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আমরা আলো জ্বালিয়া সভা সাজাইয়া সব ঠিক ঠাক করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এ নিমন্ত্রণে কি কেহ আসিবেন? দেখি যে, সন্ধ্যার পরেই লণ্ঠন আগে করিয়া এক একটি লোক আসিতেছেন।

আমরা সকলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভার সম্মুখের বাগানে বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া বাগান ভরিয়া গেল। লোক দেখিয়া আমাদেরও উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহারা কি জন্যই বা আসিয়াছেন, এবং এখানে কিই বা হইবে। আমি ব্যগ্র হইয়া ঘড়ী খুলিয়া বারে বারে দেখিতেছি, আট্‌টা বাজে কখন্‌। যেই আট্‌টা বাজিল, অমনি ছাদের উপর হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা ও শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। আর অমনি ঘরের যত গুলি দরজা ছিল, সকলই একবারে এক সময়ে খুলিয়া গেল। লোকেরা সকলেই অবাক্‌ হইয়া উঠিল। আমরা সকলকে আহ্বান করিয়া ঘরের মধ্যে বসাইলাম। সম্মুখেই বেদী। তাহার দুই পার্শ্বে দশ দশ জন করিয়া দুই শ্রেণীতে বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের গাত্রে লাল রঙের বনাত। রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন। বেদ পাঠ শেষ হইতেই রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি উঠিয়া বক্তৃতা করিলাম। সেই বক্তৃতার মধ্যে এই কথা ছিল যে "এইক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ, সর্ব্বগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা; অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের

যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।" আমার বক্তৃতার পর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করিলেন, তাহার পর চন্দ্র নাথ রায়, তাহার পর উমেশ চন্দ্র রায়, তৎপরে প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষ, তদন্তর অক্ষয় কুমার দত্ত, পরিশেষে রমা প্রসাদ রায়। ইহাতেই রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২টা বাজিয়া গেল। লোকগুলান হয়রাণ। সকলেই আফিসের ফেরতা। হয়তো কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি আমার ভয়ে কেহ সভা ভঙ্গের আগে যাইতে পারিতেছে না। কেই বা কি বুঝিল, কেই বা কি শুনিল, কিছুই না, কিন্তু সভাটা ভারি জাঁকের সহিত শেষ হইল। এই আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা এবং এই আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ সাম্বৎসরিক সভা। এই সাম্বৎসরিক সভা হইয়া যাইবার পরে ১৭৬৪ শকে আমি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিই। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রাম মোহন রায় ইহার ১১ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরে দেহ ত্যাগ করেন। আমি মনে করিলাম, যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সংকল্প তো আরও অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে সেই সমাজ দেখিতে যাই। আমি গিয়া দেখি যে, সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে সমাজের পার্শ্বগৃহে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন, সেখানে কেবল রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বর চন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং আর দুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। সূর্য্য

অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বর চন্দ্র ন্যায়রত্ন সমাজের ঘরে প্রকাশ্যে বেদীতে বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিরই সমান অধিকার ছিল। দেখিলাম, লোকের সমাগম অতি অল্প। বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাস চাদর পাতা, তাহাতে পাঁচ ছয় জন উপাসক বসিয়া রহিয়াছে। আর বেদীর পশ্চিম দিকে কয়েক খানা চৌকী পাতা রহিয়াছে, তাহাতে দুই চারি জন আগন্তুক লোক। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা বুঝাইতে লাগিলেন। বেদীর সম্মুখে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এই দুই ভাই মিলিয়া একস্বরে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন। রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। আমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম এবং তত্ত্ববোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। নির্দ্ধারিত হইল, তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনা ধার্য্য হইল এবং ২১ শে আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীর সাম্বৎসরিক সভা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠার দিবস ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত হইল। ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে যোড়াসাঁকস্থ কমল বসুর বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, এবং এই ভাদ্রমাসে তাহার যে সাম্বৎসরিক সমাজ হইত তাহা আমার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ হইবার পূর্ব্বেই ১৭৫৫ শকে উঠিয়া গিয়াছিল।

যখন আমরা ব্রাহ্মসমাজ অধিকার করিলাম, তখন ইহার উন্নতির জন্য এই চিন্তা হইল—সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে হইবে। ক্রমে আমাদের যত্নে ঈশ্বরের প্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরও বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমাদের কত উৎসাহ। প্রথমে ইহা দুই তিন কুঠরীতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে সেই

সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই একটি প্রশস্ত ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। যতই ঘর প্রশস্ত হইতে লাগিল, ততই লোকের সমাগম দেখিয়া মনে করিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। ইহাতে মনে কত আনন্দ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এত সাধ্য সাধনার পর আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব যাহা কিছু আবির্ভূত হইল, উপনিষদে দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি। এবং উপনিষদের অর্থ আলোচনা করিয়া যাহা কিছু বুঝিতে পারি, দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ে। অতএব উপনিষদের উপরে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। আমার হৃদয় বলিতেছে যে, তিনি আমার পিতা, পাতা, বন্ধু; উপনিষদে দেখি যে, তাহারই অনুবাদ—"স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা"। যদি তাঁহাকে না পাই, তবে পুত্র, বিত্ত, মান মর্য্যাদা আমার নিকটে কিছুই নহে; পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, আর আর সকল হইতে, তিনি প্রিয়। ইহার অনুবাদ উপনিষদে দেখি, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"। আমি ধনবান হইতে চাই না, মানবান হইতে চাই না, তবে আমি কি চাই? উপনিষদ বলিয়া দিলেন যে, "ব্রহ্মেত্যুপাসীত ব্রহ্মবান ভবতি"। যে ব্রহ্মকে উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়। আমি বলিলাম, ঠিক্, ঠিক্। ধনকে যে উপাসনা করে সে ধনবান হয়, মানকে যে উপাসনা করে সে মানবান হয়, ব্রহ্মকে যে উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়, উপনিষদে যখন দেখিলাম, "য আত্মদা বলদা" তখন আমার প্রাণের কথা পাইলাম। তিনি কেবল আমাদের প্রাণ দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের আত্মাও দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের প্রাণের প্রাণ নহেন, তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা। তিনি আপনার আত্মা হইতে আমাদিগের আত্মাকে প্রসব করিয়াছেন। সেই এক ধ্রুব নির্ব্বিকার অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা স্বস্বরূপে নিত্য অবস্থিতি করিয়া অসংখ্য পরিমিত আত্মা-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথা আমি উপনিষদে

স্পষ্টই পাইলাম—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন। তাঁহাকে উপাসনা করিয়া তাহার ফল আমি তাঁহাকে পাই। তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য, তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র। এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়—সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল। এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা অতি আবশ্যক হইল।

আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্য সূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রাম মোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-

দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ সন্ন্যাস আমার মত বিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েক খানা সংবাদ পত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।

আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্ত দর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না, যে হেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা

আমরা সম্পূর্ণরূপে লইতে পারিলাম না। যে হেতুক তিনি অদ্বৈত-বাদের পক্ষে টানিয়া তাহার সমুদায় অর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই ভাষ্যের পরিবর্ত্তে আমার আবার নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখিতে হইয়াছিল। যাহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, আমি ইহার সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতে বৃত্তি করিয়া ইহার অনুবাদ বাঙ্গালাতে লিখিতে লাগিলাম এবং তাহা ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রথমে কলিকাতাস্থ হেদুয়ার একটি বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয় হয়। যে হেদুয়াতে রাম মোহন রায়ের স্কুলে আমি পড়িতাম, এ, হেদুয়ার সেই বাড়ী। এই যন্ত্রালয়েই রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আসিয়া আমাকে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন। আমাদের বাড়ীতে বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না। যে হেতুক আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি ত বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়-বুদ্ধি অল্প—এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয় কর্ম্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।" আমার পিতার বিরক্ত হইবারও একটা হেতু ছিল। যখন এখানে গবর্ণর জেনারল্ লর্ড অক্‌লণ্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্ণর জেনারলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল, এই ইংরাজদের মহা ভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙ্গালীরা বলিয়াছিলেন যে, "ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙ্গালীদের ডাকেন না।" এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি একদিন ঐ বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদের লইয়া বাইনাচ ও গান বাজনা দিয়া একটা জমকাল মজলিস্ করিলেন। সেদিন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা ও পরিতোষণ করা আমার

একটি নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল; কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন পড়িয়া গিয়াছিল। আমি সেই সভা লইয়া ব্যস্ত ও উৎসাহী—আমরা সেই দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব, অতএব এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আমি আর বাগানের মজলিসে যাইতে পারিলাম না। পিতার শাসনে ও ভয়ে একবার তাড়াতাড়ি করিয়া সেই বিলাস ভূমি ঘুরিয়া চলিয়া আসিলাম। এই ঘটনাতে আমার মনের ঔদাস্য তাঁহার নিকটে বিশেষ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবধি তিনি সতর্ক হইলেন যে, আমি বেদান্ত পড়িয়া, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া, না খারাপ হই। তাঁহার মনের নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পদ ও মান মর্য্যাদাতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও যশস্বী হই। কিন্তু তিনি আমার মনে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। তবুও তো তিনি আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারেন নাই—তখন আমার হৃদয় যে বলিতেছে—"তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ?" তখন যে আমি উপনিষদে এই কথা পড়িয়াছি যে, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।" আর কি কেহ বিষয়েতে আমাকে ডুবাইতে পারে? আর কি কেহ আমাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে? বিদ্যাবাগীশ ভয় পাইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "কর্ত্তার মত নাই, অতএব আমি আর তোমাকে পড়াইতে পারিব না"। এই জন্যই আমি বাড়ীতে তাঁহাকে আসিতে বারণ করিয়া হেদুয়াতে যন্ত্রালয়ে যাইয়া আমাকে পড়াইতে বলিয়াছিলাম। তিনিও তাই করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই, তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। যখন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা—

যখন ট্রষ্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আবার এক দিন দেখি যে, সেই ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বর চন্দ্র ন্যায়রত্ন অযোধ্যাপতি রাম চন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ বোধ হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং বেদী হইতে অবতার বাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম। তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারে এমন সকল সুবিজ্ঞ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল। অতএব শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিলাম। বিজ্ঞাপন দিলাম—যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন বিদ্যাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ চন্দ্র এবং তারক নাথ মনোনীত হইলেন। আমি এই দুই জনকেই খুব ভাল বাসিতাম। আনন্দ চন্দ্রের দীর্ঘকেশ ছিল বলিয়া তাঁহাকে আদরের সহিত সুকেশা বলিয়া ডাকিতাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন যন্ত্রালয়ে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের কেহ কোন একটা ধর্ম্মভাবে বদ্ধ নাই। সমাজে জোয়ার ভাটার ন্যায় কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত নাই। অতএব যখন সমাজে লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে, লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনার জন্য আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন, তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়। কোন কার্য্যই বিধিপূর্ব্বক না করিলে তাহার কোন ফল হয় না এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে বিধিপূর্ব্বক গৃহীত হয়, যাহাতে পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার কথা ছিল। রাম মোহন রায়ের গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বিধান দেখিয়াই আমার মনে এইটি উদ্দীপিত হয়। সেই ব্রহ্মোপাসনা বিধানে আমি এই আশা পাইয়াছিলাম,—ওঁঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়া ত্রিপদাচৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥ যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ সব্রহ্ম পরমভ্যেতি” প্রণবপূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি

অর্থাৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ, আর ত্রিপাদ গায়ত্রী, এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। যে, তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া প্রণব ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে, সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রে প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা করিবার আর একটি কথা ছিল।

১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করিবার দিন স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, তাহা একটা জবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম। বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল, সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্ঠন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল। অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে এবং যখন ইহা ফলবান হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃত-লাভ করিব। "নিশ্চয় অমৃতলাভ সে ফল ফলিলে"। এই আশা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বিদ্যাবাগীশের সম্মুখে আমি বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া একটি বক্তৃতা করিলাম। "অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয় এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন"। আমার এই বক্তৃতা শুনিয়া ও আমার হৃদয়ের একাগ্রতা দেখিয়া, তিনি অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন যে, রাম মোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি

তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল”। প্রথম শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, পরে আমি। তাহার পরে পরে ব্রজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর, আনন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারক নাথ ভট্টাচার্য্য, হর দেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্র নাথ রায়, রাম নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোক নাথ রায়, প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের এই আর একদিন। ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরাণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে? ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ। সেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম। ১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন। তখন ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল ছিল। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না। যখন ব্রাহ্মদের মধ্যে পরস্পর এমন সৌহৃদ্য দেখিলাম, তখন আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। আমি মনে করিলাম যে, নগরের বাহিরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইহাঁদের প্রতি পৌষ মাসে একটা মেলা হইলে ভাল হয়। সেখানে পরস্পরের সঙ্গে

দেখা সাক্ষাৎ, সদ্ভাব বৃদ্ধি ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হইয়া সকলের উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি এই উদ্দেশে ১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ গলতার পরপারে আমার গোরিটীর বাগানে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। ৮।৯ টা বোট করিয়া সকল ব্রাহ্মকে কলিকাতা হইতে আমি ঐ বাগানে লইয়া যাই। ইহাতে তাঁহাদের সদ্ভাব, ও মনের প্রীতি ও উৎসাহ প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাগানে ব্রাহ্মদের একটি মহোৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ব্রহ্মের জয়ধ্বনি আরম্ভ করিলাম, ফলফুলে শোভিত বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিয়া মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হইলাম। উপাসনা ভঙ্গ হইলে জগদ্দলের রাখাল দাস হালদার প্রস্তাব করিলেন যে, "ব্রাহ্মদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয়। যখন আমরা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছি, তখন বর্ণপ্রভেদ না থাকাই শ্রেয়ঃ। অলখ নিরঞ্জনের উপাসক শিখ সম্প্রদায় বর্ণভেদ পরিত্যাগ করিয়া "সিংহ" এক উপাধি দিয়া সকলে এক জাতি হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এত ঐক্যবল হইল যে, দিল্লীর দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেব বাদসাকেও পরাজয় করিয়া তাহারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল"। রাখাল দাস হালদারের পিতা উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়াই আপনার বক্ষে ছুরী মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম. রাম মোহন রায়ের উপদেশ মত কেবল একমাত্র গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারাই ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল। দেখিলাম যে, সাধারণের পক্ষে এ মন্ত্র বড় কঠিন হইয়া উঠে। ইহাদ্বারা উপাসনা করিতে তাহাদের রুচি হয় না। গায়ত্রী মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিয়া, ব্রহ্মের উপাসনা করা অনেক সাধনা সাপেক্ষ। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে এ মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া যায় না। কিন্তু এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তন্নিষ্ঠ ব্যক্তি পাওয়া অতি দুর্লভ। "সহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি"। সহস্রের মধ্যে যদি কেহ এক জন হয়। আমি চাই যে, আপামর সাধারণ সকলে ব্রহ্মোপাসনা করিবে। অতএব আমি স্থির করিলাম, যাহারা গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে, তাহারা করুক; যাহারা তাহা না পারে, তাহারা যে কোন সহজ উপায়ে ঈশ্বরে আত্মা সমাধান করিতে পারে তাহাই অবলম্বন করুক। অতএব প্রতিজ্ঞাতে "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব" এই কথার পরিবর্ত্তে এই হইল যে, "প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব"। কিন্তু পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন অতি প্রশস্ত উপায়। সে শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য হইলে তাহা উপাসকের পক্ষে আশু উপকারী হয়। অতএব আমি বহু অনুসন্ধানে—উপনিষদে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী এই দুইটি মহাবাক্য লাভ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলাম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"।

ইহাতে আমার মানস পূর্ণ ও যত্ন সফল হইয়াছে। যেহেতুক এখন দেখিতেছি যে, সকল ব্রাহ্মই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপ-মমৃতং যদ্বিভাতি" শ্রদ্ধাপূর্ব্বক **উচ্চারণ** করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রতি ব্রাহ্মের একাকী নির্জ্জনে বসিয়া ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবার পক্ষে এই দুই বাক্যই যথেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মো-পাসনার জন্য একটি প্রশস্ত উপাসনা প্রণালী আবশ্যক। এই উদ্দেশে আমি এই দুই মহাবাক্য প্রথমে সংস্থাপন করিয়া তাহার সহিত উপনিষৎ হইতে আর তিনটি শ্লোক যোগ করিয়া দিলাম। প্রথম শ্লোক—"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। এই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, নিরাকার পরমেশ্বর এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, উপাসনার সময় ইহা মনন্ ও ধারণ করিবার জন্য পরে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইল—"এতস্মা-জ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী"। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

তিনি সকলের আশ্রয় এবং অদ্যাপি তাঁহারই শাসনে জগৎ-সংসার চলিতেছে, ইহা চিন্তা করিবার জন্য পরে এই তৃতীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে,

ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সকলের আশ্রয়, মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের স্তোত্র পাঠ করিবার জন্য সংশোধন করিয়া তন্ত্র হইতে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

"ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনেশাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো বয়ন্ত্বাং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥"

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ-সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বরহিত সংসার-সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশের তান্ত্রিক কুলে জন্ম। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চূড়ামণি ঘোরতর তান্ত্রিক ছিলেন, সুতরাং

তত্ত্ববাগীশের তন্ত্র শাস্ত্রে বেশ বুৎপত্তি ছিল। ব্রহ্মোপাসনা প্রণালীতে উপনিষৎ হইতে “সপর্য্যগাদাদি” তিনটি মন্ত্র যোজনা করিয়া তাহার পর তাহাতে একটি হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্মস্তোত্র সন্নিবেশ করিবার জন্য আমি বেদের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার মনের মতন কোন স্তোত্র পাইলাম না। আমি ইহাতে অতিশয় চিন্তিত ও আকুলিত হইলাম। তত্ত্ববাগীশ আমার চিন্তার বিষয় জানিয়া বলিলেন যে, তন্ত্রের মধ্যে কিন্তু একটি সুন্দর ব্রহ্মস্তোত্র আছে। আমি বলিলাম সেটি কি? তখন তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে সেই স্তোত্র পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু তাহাতে অদ্বৈতবাদ আছে বলিয়া তাহা আমি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অতএব তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিয়া লইলাম। এই স্তোত্র পঞ্চরত্নে বিভক্ত। তাহার প্রথমরত্নের প্রথম চরণে আছে, “নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়”। আমি সংশোধন করিয়া করিলাম, “নমস্তে সতে সতে তে জগৎ কারণায়। নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়”। ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে “নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়। নমো ব্রহ্মণে-ব্যাপিনে নির্গুণায়”। আমি সংশোধন করিলাম “নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়। নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়”। দ্বিতীয়রত্নের দ্বিতীয় চরণে “ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং” আছে। আমি সংশোধন করিলাম, “ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশং। তৃতীয় রত্নের চতুর্থ চরণে “রক্ষকং রক্ষকানাং” শব্দের স্থানে “রক্ষণং রক্ষণানাং” করিলাম। ইহার চতুর্থরত্ন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলাম। পঞ্চম রত্নের প্রথম চরণে “ত্বদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ” আছে। আমি সংশোধন করিলাম, “বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামঃ”। তাহার পরের চরণের “ত্বদেকং” শব্দের স্থানে “বয়ন্ত্বাং” শব্দ বসাইয়া দিলাম। সংশোধ-

নাস্তর পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, ইহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম মতে ঈশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, তিনি বিশ্বরূপ নহেন। অতএব প্রথম চরণে বলিলাম, তিনি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ ও দ্বিতীয় চরণে বলিলাম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়। তাহার পরে নমোঽদ্বৈত-তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিণে শাশ্বতায়, যিনি এই জগতের কারণ, যিনি জগতের আশ্রয়, তিনি আমাদের মুক্তিদাতা, তিনি ব্রহ্ম, সর্ব্বদেশব্যাপী ও কালের অতীত, নিত্য। তন্ত্রোক্ত এই স্তোত্র সংশোধন ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদে আমি তত্ত্ববাগীশের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, ইহার জন্য আমি এখনো তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পরে আমি একটি প্রার্থনা রচনা করিয়া উপাসনা প্রণালীর সর্ব্বশেষে তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। "হে পরমাত্মন! মোহ-কৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি"। ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মসমাজে এই উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তখন স্তোত্র পাঠের সময় তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ ব্যবহৃত হইত না। ১৭৭০ শকের পরে স্তোত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ আরম্ভ হয়। এই উপাসনাপ্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সেখানে কেবল বেদপাঠ, অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ, শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতা পাঠ এবং ব্রহ্মসঙ্গীত হইত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সিদ্ধান্তে ঈশ্বর প্রসাদে যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলাম, সেই সত্যকে জাজ্জ্বল্যতররূপে উপনিষদে পাইয়া আমার হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। উপনিষদে পাইলাম যে, তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমি এক সময়ে প্রকৃতির নিরঙ্কুশ পরাক্রমে অতিমাত্র ভীত ছিলাম। এক্ষণে আমি সুস্পষ্ট জানিলাম যে, প্রকৃতির উপরে এক জন নিয়ন্তা আছেন, "স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ" সেই এক সত্য পুরুষ স্বভাবের উপর আরূঢ় হইয়া আছেন। তাঁহার এক কশাঘাতে সব চলিতেছে। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ" তিনি রাজগণ রাজা, মহারাজা, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, ইহা জানিয়া নির্ভয় হইলাম, তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। নির্জনে একাকী তাঁহার মহদ্ভাব জাজ্জ্বল্যপ্রভাব অনুভব করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহার গুণগান করিতেছি, সব সুহৃদে মিলে সখাকে ডাকিতেছি। ইহাতে আমার সকল কামনা শেষ হইল। যতদিন তাঁহাকে না পাইয়াছিলাম; ততদিন মনে করিতাম যে, এই পৃথিবীর সকলেই ভাগ্যবান্, কেবল আমি একাই ভাগ্যহীন—"ভাগ্যহীন যমপাশ্" কত লোক ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ছুটিতেছে—কত লোক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, কত লোক জগন্নাথ ক্ষেত্রে, কত লোক দ্বারকা হরিদ্বারে, তাহার গণনা নাই। ইতস্ততঃ দেবমন্দির-সকল দেবের আবির্ভাবে পরিপূরিত, ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, মঙ্গলধ্বনিতে নিনাদিত, কিন্তু আমার কাছে তাহা সকলই শূন্য। কখন্ আমি আমার উপাস্য দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব, কখন্ আমার হৃদয়ের ভক্তি উপহার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব, কখন্ তাঁহার

মহিমা কীর্ত্তন করিব, জলাভাবে পিপাসার ন্যায় আমার এই বলবতী স্পৃহা আমাকে কঠিন দুঃখ দিতেছিল, এখন আমার সেই স্পৃহা পূর্ণ হইল, সব দুঃখ দূর হইল। এতদিন পরে করুণাময়ের এই করুণা আমি বুঝিলাম যে. তিনি তাঁহার ভক্তকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। যে তাঁহাকে চায়, সে তাঁহাকে পায়। আমি দীন দরিদ্র ভাগ্যহীনের মত এই সংসারে যে বেড়াই, তাহা তিনি আর দেখিতে পারিলেন না। তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। আমি দেখিলাম, "অয়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ"। এই সর্ব্বজ্ঞ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই আকাশে। এই জগন্মন্দিরে জগন্নাথকে দেখিলাম। তাঁহাকে কেহ কোথাও স্থাপিত করিতে পারে না, তাঁহাকে কেহ হস্ত দিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারে না—তিনি আপনাতেই আপনি নিত্য স্থিতি করিতেছেন। আমি আমার সেই প্রাণদাতা উপাস্য দেবতাকে পাইলাম এবং নির্জনে সজনে তাঁহার উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। আমি যে আশা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, সে আশা আমার পরিপূর্ণ হইল। আমি তো এতোটা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি তো এতোটুকু দিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি আরও দিতে চাহেন—মাতার ন্যায়, তিনি আরও দিতে চাহেন। যাহা আমি জানি নাই, যাহা আমি চাই নাই, তিনি তাহাও দিতে চাহেন। যদিও আমি বুঝিলাম যে, ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রীদেবীকে ধরিয়াই রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। উপনয়নের সময় যদিও আমি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যেই আমি রাম মোহন রায়ের উদ্ধৃত গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব

দেখিলাম, অমনি তাহা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। আমি তাহার অর্থ আবৃত্তি করিয়া তাহারই জপেতে সাধ্যমত নিযুক্ত হইলাম। যখন আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করি, তখন তাহার মধ্যেও গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান থাকে। গায়ত্রীমন্ত্র প্রচার করিয়া যদিও ইহার দ্বারা অন্যের উপকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, কিন্তু ইহাতে আমার সুফল ফলিল। আমি সম্যক্‌রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম। গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল! ইহাতে আমার দৃঢ়-নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মূক্ সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই পূর্ব্বে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম, এখন সেই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, কেবল মূক্ সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। তখন আমি জানিলাম যে, আমি অসহায় নহি, তিনিই আমার চিরকালের সহায়। যখন তাঁহাকে আমি না জানিয়া মুহ্যমান হইয়া ঘুরিতেছিলাম, তখনও তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার ভাল চক্ষু, জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দিলেন। এতদিন আমি জানি নাই যে, তিনি আমার হাত ধরিয়া আনিয়াছেন, এক্ষণে আমি জানিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলাম। এই অবধি আমি তাঁহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা করিতে লাগিলাম। মনের প্রবৃত্তিই বা কি, তাঁহার আদেশই বা কি, এই

দুয়ের পৃথক্ ভাব আমি বুঝিতে লাগিলাম। যাহা আমার প্রবৃত্তির কুটিল মন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হইলাম এবং তাঁহার আদেশ বলিয়া আমার ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইতে লাগিল, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন আমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তুমি আমাকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, ধর্ম্মবল প্রেরণ কর—ধৈর্য্য দেও, বীর্য্য দেও, তিতিক্ষা সন্তোষ দেও। গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম। তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি যেমন আকাশে থাকিয়া গ্রহ নক্ষত্রগণকে চালাইতেছেন, তেমনি তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধি-সকল প্রেরণ করিয়া আমার আত্মাকে চালাইতেছেন। যখনি নির্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতাম, তখনই তাঁহার শাসন অনুভব করিতাম, তখনি তাঁহার "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রুদ্রমুখ দেখিতাম, সকল শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার যখনি কোন সাধু কর্ম্ম গোপনে করিতাম, প্রকাশ্যে তিনি তাহার পুরস্কার দিতেন, তাঁহার প্রসন্ন-মুখ দেখিতাম, সমুদায় হৃদয় পুণ্য সলিলে পবিত্র হইত। আমি দেখিতাম যে, তিনি গুরুর ন্যায় নিয়ত আমার হৃদয়ে বসিয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন—সৎকর্ম্মে চালাইতেছেন, আমি বলিয়া উঠিতাম, "পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা"। দণ্ডেতেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম, পুরস্কারেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম। তাঁহার স্নেহেতেই পালিত হইয়া, উঠিতে, পড়িতে, এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি। তখন আমার বয়স ২৮ বৎসর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে; আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদায় কামনা পরিতৃপ্ত হইল এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। আমি এতোটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতোটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম, জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফল লাভ করিলাম, পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। আমি জানিতাম না যে, তাঁর এত করুণা। তাঁহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল, এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শতগুণ বাড়িল। এখন যতটুকু তাঁহাকে দেখিতে পাই, যতটুকু তাঁহার কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। "যে ছেলে যত খায়, সে ছেলে তত লালায়"। হে নাথ! তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য নবতর-রূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক। তুমি এখন আমার

নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও, তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না, তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও। ইহা বলিতে বলিতে অরুণ-কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃতদেহে-শূন্য হৃদয়ে, বিষাদ-অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেম-রবির অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, আমার চির নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন-স্রোত বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল। আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেম-পথের যাত্রী হইলাম। জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের এক দিন প্রাতঃকালে সংবাদ-পত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্র নাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, "গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশ চন্দ্রের স্ত্রী, দুই জনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশ চন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ি হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্য ডফ্-সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধুকে খ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গতকল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন"। এই বলিয়া রাজেন্দ্র নাথ কাঁদিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল—"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল

আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধৰ্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়। খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধৰ্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কৰ্ম্ম না সিদ্ধ হয়?” শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পৰ্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দুসন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধা কান্ত দেব, রাজা সত্য চরণ ঘোষাল, ওদিকে রাম গোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে

সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টানেরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৩ই জৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্রে হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি সাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথ নাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা সাক্ষর করিলেন। রাজা সত্য চরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজ নাথ ধর দুই হাজার টাকা। রাজা রাধা কান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা সাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল। এই সভা হইতে হিন্দুহিতার্থী নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধা কান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরি মোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল—একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম এবং জানিলাম যে, সেই উপনিষৎ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্যশাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা আমার সংকল্প হইল। ঐ উপনিষদকে বেদান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে। আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল। তন্ত্র-পুরাণেতেই পৌত্তলিকতার আড়ম্বর। বেদান্ত পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেন না। তন্ত্রপুরাণ পরিত্যাগ করিয়া যদি সকলে এই উপনিষদ্ অবলম্বন করে, যদি উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সকলে ব্রহ্মোপাসনাতে রত হয়, তবে ভারতবর্ষের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। সেই মঙ্গলের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যে বেদের শিরোভাগ উপনিষদ, যে বেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বেদান্ত দর্শনের এত পরিশ্রম, সে বেদকে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। রাম মোহন রায়ের যত্নে তখন কয়েক খানা উপনিষৎ ছাপা হইয়াছিল এবং যাহা ছাপা হয় নাই এমন কয়েক খানি উপনিষৎ আমিও সংগ্রহ করিয়া-ছিলাম। কিন্তু বিস্তৃত বেদের বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। টোলে টোলে ন্যায়-শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র পড়া হয়, অনেক ন্যায়বাগীশ, স্মার্ত্তবাগীশ সেখান

হইতে বাহির হন, কিন্তু সেখানে বেদের নাম গন্ধ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম যে বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, তাহা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ; কেবল বেদবিরহিত নামমাত্র উপবীৎ-ধারী ব্রাহ্মণ-সকল রহিয়া গিয়াছেন। দুই এক জন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন কেহ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনার অর্থ পর্য্যন্ত জানেন না। আমার বিশেষরূপে বেদ জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বেদের চর্চ্চা কাশীতে, অতএব সেখানে বেদ শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম। এক জন ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে কাশীধামে প্রেরণ করিলাম। তিনি তথায় মূল বেদ সমুদায় সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বৎসরে আর তিন জন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইলেন। আনন্দ চন্দ্র, তারক নাথ, বাণেশ্বর এবং রমা নাথ, এই চারি জন ছাত্র।

যখন ইহাঁদিগকে কাশীতে পাঠাই, তখন আমার পিতা ইংলণ্ডে। তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্যের ভার সকলই আমার উপরে পড়িল। কিন্তু আমি কোন কাজ কর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতাম না। কর্ম্মচারীরাই সকল কাজ চালাইত, আমি কেবল বেদ, বেদান্ত, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর ও চরম-গতিরই অনুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্ম্ম কাজের প্রতিঘাতেতে আমার উদাস ভাব আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না—জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব ; বিদেশে, বিপদে, শঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার

পালনী শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্ম্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া লও"। আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্র নাথ, সত্যেন্দ্র নাথ এবং হেমেন্দ্র নাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন—আমি রাজ নারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্র নাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্র নাথের ৫ বৎসর এবং হেমেন্দ্র নাথের ৩ বৎসর।

রাজ নারায়ণ বসুর পিতার নাম নন্দ কিশোর বসু। তিনি রাম মোহন রায়ের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে ও তাঁহার ধর্ম্মভাব, নম্র ভাব দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছিলাম। তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন—"যদি রাজ নারায়ণ ব্রাহ্ম হয় তবে বড় ভাল হয়"। জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁহার সে ইচ্ছার সফলতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ নারায়ণ বাবু সেই অশৌচ অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য। তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া, দিন, দিন তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের

খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম। তখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে কিছু ইংরাজী লেখা পড়ার প্রয়োজন, তাহার বিশেষ ভার তাঁহার উপরে দিলাম। কঠাদি উপনিষদের অর্থ আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতাম, তিনি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেন এবং সে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত। যদিও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না, তথাপি তিনি সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিতেন, তাঁহার হাস্যমুখ সর্ব্বদাই দেখিতাম। তখন তিনি আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন; তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি তাঁহাকে পরিবারের মধ্যেই গণ্য করিতাম। যখন আমি পরিবার লইয়া বেড়াইতে চলিলাম, তখন রাজ নারায়ণ বাবুকে সঙ্গে লইলাম। তিনি সেই বোটে আমার সঙ্গে রহিলেন। পিনিসে আমার স্ত্রীপুত্র-সকল। উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখনকার সেই শ্রাবণ মাসের প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে, তাহার প্রতিকূলে, অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে, চলিতে লাগিলাম। হুগলী আসিতেই তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আর দুই দিন পরে কাল্‌নাতে আসিয়া মনে হইল, যেন কতদূরেই আসিয়াছি। এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া একদিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজ নারায়ণ বাবুকে বলিলাম, আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে, চল, আমরা বোটের ছাদের উপর গিয়া বসি। তিনি বলিলেন যে, এখনও বেলার অনেক বাঁকী, ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে? এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজ নারায়ণ বাবুকে বলিলাম, চল আমরা পিনিসে যাই।

ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়। মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাদের উপর বসিয়া আছি এবং দুই জন দাঁড়ী পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে। অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের বোটের মাস্তুলের আগায় লাগিয়া গেল। সেই গুণ আমাদের এক জন দাঁড়ী লগি দিয়া ছাড়াইতেছিল। আমি সেই গুণ ছাড়ান দেখিতেছি। যে দাঁড়ী গুণ ছাড়াইতেছিল, সে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড় পড় হইল। সামাল, সামাল রব পড়িয়া গেল, মহা গোল উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তুলের দিকে তাকাইয়া আছি। দাঁড়ী সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার মস্তক বাঁচাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশ্‌মার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু চশ্‌মার তার আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি টানিয়া চশ্‌মা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম। ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়ীরা পিনিস ধরিয়া আছে এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের একটি শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্তুলটি তাহার পাল দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাস্তুলকে জড়াইয়া তাহার ছাদের উপর পড়িল। সেই খানে আমি পূর্ব্বে বসিয়াছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পাল-ভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল এবং

বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে দুই জন দাঁড়ী পিনিস ধরিয়া আছে তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল। সে দিক্‌টা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙ্গুল মাত্র জল হইতে ছাড়া। মাস্তুলে জড়ান দড়ি কাটিয়া দিবার জন্য একটা গোল পড়িয়া গেল। আন্ দা, আন্ দা। কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। এক খানা ভোঁতা দা লইয়া এক জন মাস্তুলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তার পরে আঘাত, কিন্তু এ ভোঁতা দায়ে দড়ি কাটে না। অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল, দুইটা কাটিল। তৃতীয়টা কাটিতেছে, আমি আর রাজ নারায়ণ বাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজ নারায়ণ বাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়ীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা ভারি দম্‌কা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, আবার তাই রে, তাই। বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম, রাজ নারায়ণ বাবুকেও ধরাধরি করিয়া তুলিলাম। এখন ডাঙ্গা পাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু পিনিস তখনও দৌড়িতেছে। দাঁড়ীরা চেঁচাইতে লাগিল "থামা থামা"। তখন সূর্য্য অস্ত গেল। মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল। পিনিস থামিল কি না অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি, একটা ছোট নৌকা বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম, এ আবার কি? ডাকাতের নৌকা নাকি? আমার ভয় হইল।

সেই নৌকা হইতে লাফাইয়া এক জন পাড়ের উপর উঠিল, দেখি যে, আমার বাড়ীর সেই স্বরূপ খানসামা। তাহার মুখ শুষ্ক। সে আমাকে এক খানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িলাম তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আছে। সে বলিল, কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। আপনার খোঁজে নৌকা করিয়া কত লোক বাহির হইয়াছে। কেহ আপনাকে ধরিতে পারে নাই, আমার এত কষ্ট সার্থক যে, আমি আপনাকে ধরিলাম। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমি স্তব্ধ ও বিষণ্ন হইয়া বোট লইয়া পিনিস ধরিতে গেলাম এবং সেই পিনিস ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম, সেখানে আলোতে পত্রখানা স্পষ্ট করিয়া পড়িলাম। এখন আর কি হইবে। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এখন আর কাহাকেও শুনাইলাম না। পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতা অভিমুখে ফিরিলাম। আমি যে বোটে ছিলাম তাহা ১৪টা দাঁড়ের বোট। ইহার ভিতরকার দুই পার্শ্বে বেঞ্চের উপরে আঁটা তক্তা, তাহাতে দীর্ঘ ফরাস পাতা। আমি স্ত্রীপুত্রদিগকে তাহাতে লইলাম। রাজ নারায়ণ বাবুকে সমস্ত পিনিসের অধিকার দিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। ভাদ্র মাসের গঙ্গার স্রোতে, দাঁড়ে পালে নক্ষত্র বেগে বোট ছুটিল। কিন্তু মন তাহার আগে ছুটিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টির ও বাতাসের কোলাহল। মধ্য পথে কালনাতে পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে এক মাঠের ধারে এমন তুফান উঠিল যে, নৌকা ডুব ডুব হইয়া পড়িল। নৌকা কিনারা দিয়াই যাইতেছিল। মাঝিরা তৎক্ষণাৎ ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের একটা মুড়া গাছে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল। বোট রক্ষিত হইল। তখন সেই মুড় গাছটিকে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং পরম বন্ধু বলিয়া আমার মনে হইল। পাঁচ মিনিট পরেই আবার আমার

মনের আবেগে বোট খুলিয়া দিলাম। যখন বেলা প্রায় অবসান, তখন আমি মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্য্যকে একবার দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সুখ সাগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সূর্য্য যখন অস্ত হইল, তখন আমি ফরাস ডাঙ্গায়। সেখানে দাঁড়ীদের হাত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আর তাহারা খাটিতে পারে না। আবার জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল। এ বিষম ব্যাঘাত। এখান হইতে পল্‌তায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। এখানে আসিয়া বোট কাত হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। এক একবার দমকা বাতাসে দুই এক জায়গায় ভয়ে বোট থামাইতেও হইয়াছিল। দাঁড়ীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে কাঁপিতেছে। পল্‌তায় পঁহুছিতেই কিনারা হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ি প্রস্তুত আছে। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। আমি সেই যে বোটে বসিয়াছিলাম একবারও তাহা হইতে উঠি নাই, এখন গাড়ির কথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বোটের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে, সেখানে আমার এক হাঁটু জল। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে। সকলই বৃষ্টির জল। আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতেও পারি নাই। যদি পল্‌তায় গাড়ি না থাকিত—যদি আমরা নৌকায় বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতাম, তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত ; এ কথা আর কাহাকে বলিতেও পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়িতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতরে গাড়ির চাকা অর্দ্ধেক মগ্ন। অতি কষ্টে বাড়ী পঁহুছিলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠক্ খানার তেতালায় উঠিলাম। সেখানে আমার

জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজ বাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে সেখানে একাকী অত রাত্রি পর্য্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইল!! কেন তাহা জানি না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

১৭৭৮ শকে শ্রাবণ মাসে লণ্ডন নগরে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ৫১ বৎসর বয়ঃক্রম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ এবং আমার পিস্তুত ভাই নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভাদ্র মাসে আমি সেই সংবাদ প্রাপ্ত হই। মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির পর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার কুশ-পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া আমার মধ্যম ভ্রাতার সহিত গঙ্গার পর পারে যাইয়া তাঁহার দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করি। এই দিবস হইতে আমরা যথারীতি দশ দিবস অশৌচ ধারণ পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অশৌচ-কালে শিষ্টাচার রক্ষার নিমিত্ত প্রতি দিবস প্রাতে উঠিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত খালি পায় কলিকাতার তাবৎ মান্য লোকদিগের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতাম এবং মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই সকল আগন্তুক ভদ্র লোকদিগকে আপনার বাটীতে অভ্যর্থনা করিতাম। পিতৃবিয়োগে পুত্রের যেরূপ কঠোর তপস্যা পালন করিতে হয়, তাহা আমি সমুদায় করিয়াছিলাম। আমার ছোট কাকা রমা নাথ ঠাকুর আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "দে'খো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এ সময় কোন গোলমাল তুলিও না। দাদার বড় নাম"। আমি যখন রাজা রাধা কান্ত দেবের কাছে সাক্ষাৎ করিতে গেলেম, তিনি আমাকে কাছে বসাইয়া আমার পিতার অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিলেন "শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধান আছে, সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করিও"। তাঁহাকে আমি বিনয়ের

সহিত বলিলাম, আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত লইয়াছি, সে ব্রতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিব না। তাহা করিলে ধর্ম্মে পতিত হইব। আমি কিন্তু শ্রাদ্ধ যে করিব, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদের মতে করিব। তিনি বলিলেন "সে হবে না, সে হবে না, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ বিধিপূর্ব্বক হবে না। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। আমি যাহা বলিতেছি তাহা শুনো, তাহা হইলে সব ভাল হইবে"। আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম, আমরা যখন ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখন তো আর শালগ্রাম আনিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিব না। যদি তাহাই করিব, তবে ব্রাহ্মই বা কেন হইলাম—প্রতিজ্ঞাই বা কেন করিলাম? তিনি নতশিরে মৃদুস্বরে বলিলেন "তাহা হইলে সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, সকলে আমাদিগের বিপক্ষ হইবে, সংসার আর তবে কি করিয়া চলিবে, মহা বিপদেই পড়িব"। আমি বলিলাম, "তাই বলিয়া পৌত্তলিকতাতে যোগ দিতে পারা যায় না"। কাহারো নিকট হইতে আর আমি এ বিষয়ে উৎসাহ পাই না। আমার প্রিয় ভ্রাতাও আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। সকলেই আমার মতের বিরোধী। এমনি বিরুদ্ধ ভাব দাঁড়াইল, যেন আমি সকলকে রসাতলে ডুবাইতে যাইতেছি। সকলের মনে হইল, যেন আমার একটি কাজে সকল থাকে বা সকল যায়। আমি একা এক দিকে, আর সকলেই আমার আর এক দিকে। কাহার কাছে একটি আশ্বাস বাক্য পাই না—সাহসের কথা পাই না। যখন আমার চারি দিকে কেবল এই প্রকার বাধা, সেই অসহায় বন্ধুহীন অবস্থায় কেবল এক জন ব্রহ্মনিষ্ঠ আমার সহায় হইলেন এবং আমার প্রাণের কথা বলিয়া উঠিলেন—"লোক ভয় আবার ভয়! 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়' তাঁহাকে ভয় কর। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়, তাহার কাছে লোকনিন্দা কি? প্রাণ গেলেও আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িব না।" ইনি কে? ইনি

লালা হাজারীলাল। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাহসে বাঙ্গালী হইতে পশ্চিম দেশ-বাসী হিন্দুস্থানীরা যে বড়, এই সঙ্কট সময়ে আমি তাহার পরিচয় পাইলাম। আমার সঙ্গে একমনা ও এক-হৃদয় হইয়া আমার স্বপক্ষে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন আমার পিতামহ বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হাজারী লালকে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক দেখিয়া তাহাকে তিনি সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহার জীবনের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পক্ষে বিপরীত ঘটিল। সে কলিকাতায় আসিয়া নগরের পাপস্রোতে ভাসিয়া গেল। তাহাকে কে বা দেখে, কে বা তার সংবাদ লয়,—অসৎ সঙ্গে পড়িয়া তাহার জীবন পাপময়, কলঙ্কময় হইল। এই দুরবস্থায় ঈশ্বর প্রসাদে সে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় পাইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের বল তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল এবং সে সেই বলে পাপস্রোত অতিক্রম করিয়া আবার পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিল। সেই হাজারী লাল আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হন। আপনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুটিল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, তখন তিনি আবার পুণ্য-পথে অন্যকে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতার ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মানী সকলের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃষ্ট মঙ্গল পথ দেখাইতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে তখন যে অত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহারই যত্নে। তিনিই আমাকে এই সঙ্কট সময়ে বলিলেন, "লোক ভয় আবার কি ভয়? ঈশ্বর বড় না লোক বড়"? আমি তাঁহার বাক্যে সাহস ও উৎসাহ পাইলাম। আমার হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি আরো জ্বলিয়া উঠিল। এই আলোচনা ও শোচনাতে রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হয় না। একে পিতৃবিয়োগ, তাহাতে এই লৌকিকতাতে সারাদিন পরিশ্রম ও কষ্ট, তাহার উপরে আমার এই আন্তরিক ধর্ম্ম-যুদ্ধ। ধর্ম্মের

জয় কি সংসারের জয়, কি হয় বলা যায় না, এই ভাবনা। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি "আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও, আমাকে আশ্রয় দাও" এই সকল চিন্তাতে শোচনাতে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। বালিসের উপরে মাথা ঘুরিতে থাকে। রাত্রিতে একবার তন্দ্রা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছি। নিদ্রা জাগরণের যেন সন্ধিস্থলে রহিয়াছি। এই সময়ে সেই অন্ধকারে এক জন আসিয়া বলিল—"উঠ" আমি অমনি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল "বিছানা হইতে নাম" আমি বিছানা হইতে নামিলাম, সে বলিল "আমার পশ্চাতে পশ্চাতে এসো"। আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। বাড়ীর ভিতরের যে সিঁড়ি তাহা দিয়া সে নামিল, আমিও সেই পথে নামিলাম—নামিয়া তাহার সঙ্গে উঠানে আসিলাম। সদর দেউড়ীর দরজায় দাঁড়াইলাম। দরওয়ানেরা নিদ্রিত। সে সেই দরজা ছুঁইল, অমনি তাহার দুই কপাট খুলিয়া গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় আইলাম। ছায়া পুরুষের ন্যায় তাহাকে বোধ হইল। আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু সে আমাকে যাহা বলিতেছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা বাধিত হইয়া করিতে হইতেছে। এখান হইতে সে উর্দ্ধে আকাশে উঠিল, আমিও তাহার পশ্চাতে আকাশে উঠিলাম। পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ নক্ষত্র, তারকা-সকল দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, সমুজ্জ্বল হইয়া আলোক দিতেছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিতেছি। যাইতে যাইতে একটা বাষ্প-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আর তারা নক্ষত্র কিছুই দেখিতে পাই না। বাষ্পের মধ্যে খানিক দূর যাইয়া দেখি যে, সেই বাষ্প-সমুদ্রের উপদ্বীপের ন্যায় একটি পূর্ণচন্দ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার যত নিকটে যাইতে লাগিলাম সেই চন্দ্র তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর তাহাকে গোলাকার বলিয়া বোধ হইল না, দেখি-

লাম, তাহা আমাদের পৃথিবীর ন্যায় চেটাল। সেই ছায়া-পুরুষ গিয়া সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইল, আমিও সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইলাম। সে সমুদায় ভূমি শ্বেত প্রস্তরের। একটি তৃণ নাই। না ফুল আছে, না ফল আছে। কেবল শ্বেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার যে জ্যোৎস্না তাহা সে সূর্য্য হইতে পায় নাই। সে আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত। তাহার চারিদিকে যে বাষ্প তাহা ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিতে পারে না। তাহার নিজের সে রশ্মি, অতি স্নিগ্ধ। এখানকার দিনের ছায়ার ন্যায় সেখানকার সে আলোক। সেখানকার বায়ু সুখস্পর্শ। মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সেখানকার একটা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সকল বাড়ী, সকল পথ শ্বেত প্রস্তরের, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাস্তায় একটি লোকও দেখিলাম না, কোন কোলাহল নাই, সকলই প্রশান্ত। রাস্তার পার্শ্বে একটা বাড়ীতে আমার নেতা প্রবেশ করিয়া তাহার দোতালায় সে উঠিল, আমিও তাহার সঙ্গে উঠিলাম। দেখি যে, একটা প্রশস্ত ঘর। ঘরে শ্বেত পাথরের টেবিল ও শ্বেত পাথরের কতকগুলা চৌকি রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল "বসো"। আমি একটা চৌকিতে বসিলাম। সে ছায়া বিলীন হইয়া গেল। আর সেখানে কেহই নাই। আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি; খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখের একটা দরজার পর্দ্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাঁহার যেমন চুল এলোনো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলোনোই রহিয়াছে। আমিতো তাঁহার মৃত্যুর সময়ে মনে করিতে পারি নাই যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আইলাম তখনো মনে করিতে পারি নাই যে, তিনি মরিয়াছেন। আমার নিশ্চয় যে, তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম, আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি

বলিলেন—"তোকে দেখবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে *ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস্? কুলং* পবিত্রং জননী কৃতার্থা"। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার এই মিষ্ট কথা শুনিয়া, আনন্দ প্রবাহে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে, আমি সেই বিছানাতেই ছট্ ফট্ করিতেছি।

শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে পশ্চিম প্রাঙ্গনে দীর্ঘ চালা প্রস্তুত হইল। দান-সাগরের সোণা রূপার ষোড়শে সেই চালা সজ্জিত হইল। ক্রমে ক্রমে জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবে প্রাঙ্গন পুরিয়া গেল। আমি পৌত্তলিকতার সংস্রব বর্জ্জিত দানোৎসর্গের একটি মন্ত্র স্থির করিয়া দিয়া শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে বলিয়া রাখিলাম যে, দানোৎসর্গের সময় তুমি আমাকে এই মন্ত্র পড়াইও। এদিকে পুরোহিত আত্মীয় স্বজনেরা চালার মধ্যস্থলে শালগ্রামাদি স্থাপন করিয়া আমার উপবেশন অপেক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে গোলমাল, চারিদিকে লোক জনের ভিড়। আমি এই অবসরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে লইয়া শ্রাদ্ধস্থানের এক সীমান্তে যাইয়া আমার সেই নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র দ্বারা দানসামগ্রী উৎসর্গ করিতে লাগিলাম। দুই তিনটা দান শেষ হইয়া গেল; তখন আমার পিস্তুত ভাই মদন বাবু ইহা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা এখানে কি করিতেছ, ওদিকে যে দান উৎসর্গ হইতেছে। সেখানে শালগ্রাম নাই, পুরোহিত নাই, কিছুই নাই।" আবার অন্য দিকে আর এক গোল, সকলে বলিতেছে—"ঐ কীর্ত্তনীয়াদের আসিতে দিল না" নীল রতন হালদার বলিলেন—"আহা! কর্ত্তা কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন"। আমার ছোট কাকা রমা নাথ ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কীর্ত্তনীয়াদের আসিতে বারণ করিলে কেন?" আমি বলিলাম, আমি তো তার কিছুই জানি না,

আমি তো বারণ করি নাই। তিনি বলিলেন "ঐ যে হাজারী লাল কীর্ত্তনীয়াদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিতেছে না"। আমি তাড়াতাড়ি ষোড়শ ও দানসামগ্রী-সকল উৎসর্গ করিয়াই আমার তেতালায় চলিয়া গেলাম। কাহারও সঙ্গে তাহার পর আর আমার সাক্ষাৎ হইল না। শুনিলাম, গিরীন্দ্র নাথ শ্রাদ্ধ করিতেছেন। এই সকল গোল মিটিয়া গেলে মধ্যাহ্নের পর আমি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ও কয়েক জন ব্রাহ্মকে লইয়া নীচের তালায় আমার পাথরের ঘরে কঠোপনিষৎ পাঠ করিলাম; যেহেতুক কঠোপনিষদে আছে যে, শ্রাদ্ধকালে যে এই উপনিষৎ পাঠ করে, তার সেই শ্রাদ্ধের ফল অনন্ত হয়। সেদিন আর কোন কথার উত্থাপন হইল না। জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব যেখান হইতে যিনি আসিয়াছিলেন, সকলেই আহার করিয়া চলিয়া গেলেন। পর দিবস ভোজের নিমন্ত্রণে জ্ঞাতি কুটুম্ব আর কেহই আইলেন না। তাঁহারা সকলে আমাকে ত্যাগ করিলেন। আমার খুড়ো, খুড়তুতো ভাই, জেঠতুতো ভাই ও আমার চারি পিসি আমার সঙ্গে যোগ দিয়া রহিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী। ইহাতেই আমাকে কেহ এক-ঘরে করিতে পারিল না। আমি গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম—"তুমি যে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে কি ফল হইল? তোমার কৃত শ্রাদ্ধ কেহ তো স্বীকার করিল না। অথচ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। যাহাদের সন্তোষের জন্য তুমি তোমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, তাহারা তো ভোজে যোগ দিল না। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি দেবেন্দ্র পুনরায় এরূপ না করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব"। আমি উত্তর দিলাম—"যদি তাই হবে তবে এতটা কাণ্ড কেন করিলাম। আমি আর পৌত্তলিকতার সঙ্গে মিলিতে পারিব না"। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই

প্রথম দৃষ্টান্ত। জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে য়ুরোপে প্রথম বার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমীদারি এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমীদারি আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমীদারিও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্ব্বে ১৭৬২ শকে আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমীদারির সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রষ্টডিড্ লিখিয়া তিন জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন—আমরা কেবল তাহার উপসত্ব ভোগী রহিলাম। তাঁহার এই কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রথম বার য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয় মাস পরে ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে একটা উইল করিলেন।

তাহাতে তাঁহার সমুদায় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন ; ভদ্রাসন বাড়ী আমাকে, তেতালার বৈঠক খানা বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্র নাথকে এবং বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গনের ভূমি সমুদায়টা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ আমার পিতার, আর অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবেরা ছিলেন ; ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না, আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম। গিরীন্দ্র নাথের খুব বিষয়-বুদ্ধি ছিল। যখন হাউসের উপরে তাঁহার অধিকার জন্মিল, তখন এক দিন আমার নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, "যখন হাউসের মূল ধন সকলি আমাদের, তখন সাহেবদিগকে হাউসের অংশ দেওয়া কেন হয়? সমুদায় বিষয় আমাদের অধিকারে আসুক না কেন? এ কথা আমার মনে ধরিল না। বলিলাম—"এ প্রস্তাব বড় ভাল নয়। আপনারদিগকে অংশী মনে করিয়া সাহেবেরা এখন যেমন উৎসাহে, যে মনের বলে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে আমাদের কাজে তাহাদের তেমন দৃষ্টি ও উদ্যম থাকিবে না। আমরা একা একা কিছু এই বৃহৎকার্য্য চালাইতে পারিব না, কাজের জন্য তাহাদের চাইই চাই। অংশী বলিয়া তাহারা যেমন লাভের অংশ পায়, তেমনি ক্ষতির সময়ে তাহাদেরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর অংশ না দিয়া তাহাদিগকে বেতন ভোগী চাকর করিয়া রাখিলে তাহাদের মোটা মোটা মাহিয়ানা

আমাদের যোগাইতেই হইবে; অথচ এখন হাউসের লাভের প্রতি তাহাদের যে যত্ন আছে, তখন আর তাহা থাকিবে না। অতএব তোমার এ প্রস্তাব আমার ভাল বোধ হইতেছে না"। তিনি আমাকে বুঝাইলেন যে, "সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক্ সম্পত্তি নাই। যদি কখন বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনেরা আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে—আমাদেরই বিষয় আটক পড়িবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথা সর্ব্বস্ব দিতে থাকিব। এখনো দেখুন কি হইতেছে। আমাদের জমীদারির সকল টাকাই এই হাউসে ঢালা হইতেছে—যতই টাকা দেওয়া যাইতেছে ততই ইহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার এ রাক্ষসী ক্ষুধা আর মিটে না। কিন্তু সাহেব অংশীরা ইহাতে এক পয়সাও দেন না। এই কথায় আমি তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে হাউসের উপর কর্ত্তৃত্ব ভার দিলাম এবং আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য প্রচুর অবসর পাইলাম।

এখন আমরা তিন ভাই অবিভাগে সমস্ত হাউসের অধিকারী হইলাম। পূর্ব্বকার অংশী সাহেবদিগকে যাহার যেমন অংশ ছিল সেই অনুসারে কাহাকেও বা এক হাজার টাকা, কাহাকেও বা দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনে হাউসের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তাহারা অগত্যা তাহা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। গিরীন্দ্র নাথের প্রস্তাবে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্যের এই নূতন প্রণালী নিবদ্ধ হইল। তাহাতে আমি সম্মত হওয়ায় তিনি উৎসাহ পাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক যথাসাধ্য হাউসের বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা উপনিষদের উপদেশে জানিলাম, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, এই সকলি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আর যাহার দ্বারা পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই কথা আমরা অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে এ কথার খুব মিল হইয়া গেল। আমাদের সেই লক্ষ্য সাধারণের নিকটে ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ হইতে তাহার শিরো-ভাগে এই বেদবাক্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তঞ্ছন্দো-জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। যখন আমরা ইহাদ্বারা বুঝিলাম যে, বেদের মধ্যে দুই বিদ্যা আছে—পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা, তখন অপরা বিদ্যার বিষয় কি এবং পরা বিদ্যারই বা বিষয় কি, তাহা বিস্তাররূপে জানিবার জন্য বেদের অনুসন্ধানে উৎসুক হইলাম। আমি স্বয়ং কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। লালা হাজারী লালকে সঙ্গে লইয়া ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে পাল্কীর ডাকে কাশী যাত্রা করিলাম। ১৪ দিনে অতি কষ্টে আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাতীরে মানমন্দিরে আমার বাসস্থান হইল। আমার প্রেরিত ছাত্রেরা সেখানে আমাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় পাঠের অবস্থা এবং কাশীর সংবাদ আমাকে জানাইলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, "কাশীর প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার এখানে একটা সভা করিতে হইবে। আমি সব বেদ শুনিতে চাই এবং বেদের অর্থ বুঝিতে চাই। রমানাথ! তুমি তোমার ঋগ্বেদের

গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। বাণেশ্বর! তুমি তোমার যজুর্ব্বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। তারক নাথ! তুমি তোমার সাম বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর সামবেদী ব্রাহ্মণ-দিগকে নিমন্ত্রণ করেন। আনন্দ চন্দ্র! তুমি তোমার অথর্ব্ব বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর অথর্ব্ব বেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। এই প্রকারে কাশীর সকল ব্রাহ্মণদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া গেল। কাশীতে একটা রব উঠিল যে, বাঙ্গালা হইতে কে এক জন শ্রদ্ধাবান্ যজমান আসিয়াছেন, তিনি সমস্ত বেদ শুনিতে চান। বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডা আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন ও আমাকে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম, আমি এই তো এই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেই আছি, আর কোথায় যাইব? আমার কাশী পহুঁছিবার তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে মান মন্দিরের প্রশস্ত গৃহে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহা-দের সকলকে চারি পংক্তিতে বসাইলাম। ঋগ্বেদের এক পংক্তি, যজুর্ব্বেদের দুই পংক্তি এবং অথর্ব্ব বেদের এক পংক্তি, সামবেদী দুইটি মাত্র বালক; তাহাদিগকে আমার পার্শ্বে বসাইলাম। তাহারা নূতন ব্রহ্মচারী, এখনো তাহাদের কর্ণে কুণ্ডল আছে। তাহাতে তাহাদের মুখের বড় শোভা হইয়াছে। বাণেশ্বর চন্দনের বাটী লইলেন, তারক নাথ ফুলের মালা লইলেন, রমা নাথ কাপড়ের থান লইলেন এবং আনন্দ চন্দ্র ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা লইলেন। ব্রাহ্মণের ললাটে বাণেশ্বর যেমন চন্দনের ফোঁটা দিলেন অমনি তারক নাথ তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলেন; রমা নাথ তৎপরে তাঁহাকে এক খানা থান কাপড় দিলেন; অবশেষে আনন্দ চন্দ্র তাঁহার হস্তে দুইটি টাকা দিলেন। এইরূপে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ফোঁটা, মালা, কাপড় ও মুদ্রা বিতরিত হইল ব্রাহ্মণেরা এই পূজা গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া বলিলেন,

"যজমান বড়া শ্রদ্ধাবান্ হ্যায়। কাশীমে এয়্সা কোহি কিয়া নহি"। আমি যোড় হস্তে বলিলাম, এখন আপনারা বেদ পাঠ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা সকলে মিলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহ সহকারে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" পাঠ করিলেন। তাহার পরে যজুর্ব্বেদীরা যজুর্ব্বেদ আরম্ভ করিলেন। যেই তাঁহারা "ঈষেত্বা, ঊর্জ্জেত্বা" পাঠ ধরিলেন, অমনি এক জন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যজমান হাম্‌কো অপমান কিয়া"। আমি বলিলাম কিসের অপমান? তিনি বলিলেন—"কৃষ্ণ যজু প্রাচীন যজু হ্যায়, উস্‌কা সম্মান আগে নহি হুয়া, উস্‌কা পাঠ আগে নহি হুয়া, হাম লোক্‌কা অপমান হুয়া"। আমি বলিলাম, তোমরা আপসে এ বিষয় মিট মাট করিয়া লও। এখন এই দুই দলে বিবাদ বাধিয়া গেল—কে আগে পড়িবে। আমি যখন দেখিলাম তাঁহাদের বিবাদ আর কোন মতে মিটে না, তখন আমি তাঁহাদের দুই দলকেই একত্র পড়িতে বলিলাম। এই কথায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া দুই দলেই উচ্চৈঃস্বরে গোলমালে পড়িতে লাগিলেন—কিছুই বুঝা যায় না। তখন আমি বলিলাম, তোমাদের দুই দলেরই তো মান রক্ষা হইল, এখন এক দল নিরস্ত হও, এক দল পাঠ কর, তখন প্রথম শুক্ল যজুর পাঠ হইয়া পরে কৃষ্ণ যজুর পাঠ হইল। যজুর্ব্বেদ পাঠ করিতে অনেক সময় লাগিল। সামবেদী বালকদের সাম গান শুনাইবার বড় উৎসাহ। যজুর্ব্বেদ পাঠের বিলম্বে তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। যজুর্ব্বেদ পাঠ শেষ হইলেই তাহারা আমার মুখের দিকে তাকাইল, আমি বলিলাম, পড়। অমনি তাহারা দুই জনে সুমধুর স্বরে "ইন্দ্র আয়াহি" সাম গান ধরিল। এমন সুমিষ্ট সাম গান আমি আর কখনো শুনি নাই। সর্ব্বশেষে অথর্ব্ববেদীরা পড়িলেন এবং সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। সভা ভঙ্গের পরে ব্রাহ্মণেরা আমার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন "যজমান একঠো ব্রাহ্মণ ভোজন দিজে। একঠো উদ্যানমে হামলোক সব মিলকে

ভোজন করেঙ্গে”। আমি তাঁহাদের কথায় উত্তর দিতে না দিতে তারক নাথ আমাকে কাণে কাণে বলিলেন, “ইহাঁদের আবার ব্রাহ্মণ ভোজন। আমাদের সকলি যোগাইতে হইবে, আর ইহাঁরা এক ময়দানে এক একটা চৌকা কাটিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাইবেন। ইহাতে আমাদের কি হইবে? এ তো আমাদের মত ব্রাহ্মণ ভোজন নয় যে, আমরা রাঁধিয়া দিব, তাঁহারা খাইবেন”। আর একজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন “আমাদের এখানে শীঘ্র একটা যজ্ঞ হইবে, আপনি যদি তাহা দেখিতে যান তো দেখিতে পাইবেন”। আমি বলিলাম, আমি তো ইহারই জন্য এখানে আসিয়াছি। তিনি বলি-লেন “হামলোক্‌কা যজ্ঞমে পশু বধ নহী হোতা হ্যায়। পিঠালী মে পশু নির্ম্মাণ কর্‌কে হামলোক যজ্ঞ কর্‌তে হৈঁ”। আর দিক হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, “যো যজ্ঞমে পশু বধ নহী, উহ্‌ যজ্ঞ ক্যা যজ্ঞ হ্যায়? বেদমে হ্যায় “শ্বেতমালভেত”। শ্বেত ছাগল কো বধ করেগা। আমি দেখিলাম, যজ্ঞতেও দলাদলি আছে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেখানকার এক জন শুদ্ধ সত্ব ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া আমাকে ভোজন করাইলেন। আবার অপরাহ্ণ ৩ টার সময়ে কাশীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রালোচনার জন্য মান মন্দিরে আসিলেন। তাঁহাদের সভায় বেদের জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড এবং অন্যান্য শাস্ত্রের তর্ক বিতর্ক হইল। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “যজ্ঞে পশুবধ বেদবিহিত কি না?” তাঁহারা বলিলেন, “পশুবধ না করিলে কখন যজ্ঞ হয় না।” এই প্রকারে পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রা-লোচনা হইতেছে, এমন সময়ে কাশীর রাজবাড়ীর এক জন বাবু (বাবু বলিলে রাজার ভ্রাতাদিগকে বুঝিতে হইবে) আসিয়া আমাকে বলিলেন—“মহারাজের ইচ্ছা যে, আপনার সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হয়”। আমি তাঁহার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। পরে

সভা ভঙ্গ হইল এবং শাস্ত্রীরা টাকা বিদায় লইয়া বাড়ী গেলেন। এক জন শাস্ত্রী বলিলেন, "আপকা দান গ্রহণ কর্‌কে হমলোক তৃপ্ত হুয়া। *কাশীমে শূদ্রকা দান লেনেসে শরীর রোমাঞ্চিত হোতা হেয়্"। পর দিনে সেই বাবু আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া কাশীর পরপারে রাম নগরে লইয়া গেলেন। রাজা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। বাবু আমাকে রাজার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। ঘরগুলান ছবিতে, আয়নাতে, ঝাড় লণ্ঠনে, গালিচা দুলিচায়, মেজ কেদারায় দোকানের ন্যায় ভরা রহিয়াছে। আমি এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতেছি, দেখি যে, আমার সম্মুখেই দুই জন বন্দী, রাজার যশোগান ধরিয়াছে। সে স্বর অতি মনোহর, ইহাতে রাজার আগমন সংবাদ বুঝিলাম। তিনি উপস্থিত হইয়াই আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সভাতে লইয়া গেলেন। অমনি সেখানে নৃত্য, গীত আরম্ভ হইল। তিনি আমাকে একটি হিরার অঙ্গুরী উপহার দিলেন। আমি অতি বিনয়ের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তিনি বলিলেন—"আপকা সাথ মিলনেসে হমারা বড়া আনন্দ হুয়া। দশমীকি রামলীলামে আপকা জরুর আনা"। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে কাশী ফিরিয়া আসিলাম। আবার রামলীলার দিন রামনগরে উপস্থিত হইলাম। দেখি, রাজা মস্ত একটা হাতীতে বসিয়া আলবোলা টানিতেছেন। তাঁহার পিছনে ছোট একটা হাতীতে তাঁহার হুঁকাবর্‌দার একটা হিরার আলবোলা ধরিয়া রহিয়াছে। আর একটা হাতীতে রাজগুরু গেরুয়া কাপড় পরা, মৌনী। পাছে কথা কহিয়া ফেলেন এজন্য তাঁহার জিহ্বাতে একটা কাঠের খাপ দেওয়া রহিয়াছে। ইহাতেও তাঁহার আপনার উপরে নির্ভর নাই। চতুর্দ্দিকে কর্ণেল, জর্ণেল, সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক এক হাতীতে চড়িয়া রাজাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আমিও চড়িবার জন্য একটা হাতী পাইলাম।

আমরা সকলে মিলিয়া সেই রাম লীলার রঙ্গভূমিতে যাত্রা করিলাম। মেলায় গিয়া দেখি যে, সেখানে লোকে লোকারণ্য। যেন সেখানে আর একটা কাশী বসিয়াছে। সেই মেলার এক স্থানে একটা সিংহাসনের মত। তাহা ফুলে ফুলে সাজান। উপরে চন্দ্রাতপ। সেই সিংহাসনে একটি বালক ধনুর্ব্বাণ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। লোকে যাইয়া তাহাকে ঢুস্ ঢুস্ করিয়া প্রণাম করিতেছে। এ ক্ষেত্রে তিনিই অযোধ্যাপতি রাম চন্দ্র। খানিক পরে যুদ্ধক্ষেত্র। এক দিকে কতকগুলা সং-রাক্ষস, তাহাদের কাহারো কাহারো মুখ উটের মত, কাহারো ঘোড়ার মত, কাহারো বা ছাগলের মত। কাতারে কাতারে তাহারা সকলে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছে। ঘোড়ার মুখ উটের কাণের কাছে, উটের মুখ ছাগলের কাণের কাছে যাই-তেছে, এইরূপে পরস্পর কাণাকাণি করিতেছে। ভারি একটা যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছে। খানিক পরে তাহাদের মধ্যে একটা বোম পড়িল, আর চারিদিকে আতস বাজি হইতে লাগিল। আমি কাহাকে কিছু না বলিয়া ওখান হইতে চলিয়া আসিলাম। পরে কাশী হইতে নৌকাপথে বিন্ধ্যাচল দেখিয়া মৃজাপুর পর্য্যন্ত গেলাম। তখন বিন্ধ্যাচলের সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিয়াও যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ হইল, তাহা বলিতে পারি না। সকাল অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রৌদ্রে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া নৌকায় ফিরিয়া আইলাম এবং একটু দুগ্ধ পাইলাম, তাহা খাইয়া বাঁচিলাম। সেই বিন্ধ্যাচলে যোগমায়া দেখিলাম এবং ভোগমায়াও দেখিলাম। পাথরে খোদা দশভুজা যোগমায়া। একটি যাত্রী বা একটি লোকও সেখানে দেখিলাম না। ভোগমায়ার মন্দিরে গিয়া দেখি, কালীঘাটের ন্যায় সেখানে ভীড়। লাল পাগড়ী পরা খোট্টারা রক্তচন্দনের ফোঁটা এবং জবাফুলের মালা পরিয়া পাঁটা কাটিয়া রক্তের ছড়াছড়ি করিতেছে। এ একটা আমার অদ্ভুত বোধ হইল।

আমি তাহাদের ভীড় ঠেলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। ঝাঁকি দর্শন করিয়া আসিলাম। তাহার পর মৃজাপুর হইতে এক ষ্টীমার* করিয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। কাশী হইতে সেই যাত্রায় আনন্দ চন্দ্রকে লইয়া কুমারখালী পর্য্যন্ত আসিলাম। কুমারখালীতে আমার জমীদারী পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর আর ছাত্রেরা পরে কলিকাতায় আসিয়া সমাজের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। লালা হাজারী লাল কাশী হইতে রিক্ত হস্তে প্রচারের জন্য দূর দূরান্তে বহির্গত হইলেন। একটি অঙ্গুরী মাত্র সম্বল ছিল, তাহাতে খোদিত ছিল "ইহ্ ভি নেহী রহে গা"। সেই যে তিনি গেলেন, আর ফিরিলেন না, তাহার পর আর তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এইক্ষণে এই নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, বেদে অপরা বিদ্যার বিষয় কেবল দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ। ঋগ্বেদের হোতা, তিনি যজ্ঞে দেবতার স্তুতি করেন। যজুর্ব্বেদের অধ্বর্য্যু, তিনি যজ্ঞে দেবতাকে হবি দান করেন। সামবেদের উদ্গাতা, তিনি যজ্ঞে দেবতার মহিমা গান করেন। এই বেদের দেবতা মোটে তেত্রিশটি। তাঁহাদের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুত, সূর্য্য, ঊষা, এই কয়েকটি প্রধান। বেদের সকল ক্রিয়াতেই অগ্নি আছেন। অগ্নিকে ছাড়িয়া বেদের যজ্ঞই হয় না। অগ্নি দেবতা যজ্ঞে কেবল স্তবনীয় নহেন, তিনি আবার যজ্ঞের পুরোহিত। রাজার পুরোহিত যেমন রাজার অভীষ্ট সম্পাদন করেন, অগ্নি স্বয়ং যজ্ঞের পুরোহিত হইয়া হোম সম্পাদন করেন। অগ্নিতে যে যে দেবতার উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয়, অগ্নি সেই সেই দেবতাকে সেই হবি বণ্টন করিয়া দেন। অতএব তিনি কেবল পুরোহিত নহেন, তিনি আবার দেবতাদের দূত। আর হবি দান করিয়া যজমানেরা যে যে দেবতার নিকট হইতে যে যে ফল প্রাপ্ত হন, তাহা অগ্নি ভাণ্ডারীর ন্যায় তাঁহাদিগকে বণ্টন করিয়া দেন। অগ্নি-দেবতার অনেক কার্য্য। বেদে অগ্নি-দেবতার একাধিপত্য। আবার দেখ, এই অগ্নি ব্যতীত আমাদের কোন গৃহ্যকর্ম্ম সমাধা হইতে পারে না। জাত-কর্ম্ম অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই অগ্নি। অগ্নি বিবাহের সাক্ষী। শূদ্রের বেদে কোন অধিকার নাই, তথাপি বিবাহের সাক্ষীর জন্য তাহার অগ্নি চাই। তাহাতে তাহার অমন্ত্রক হবি দান করিতে হয়। আমাদের মধ্যে অগ্নি দেবতার যে এত আধিপত্য, আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। বালককাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, শালগ্রাম শিলা

না হইলে আমাদের কোন কাজ হয় না। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে শালগ্রাম, পূজা পার্ব্বণে শালগ্রাম, শালগ্রাম আমাদের গৃহদেবতা। সর্ব্বত্র শালগ্রাম দেখিয়া তাহারই একাধিপত্য মনে করিতাম। শালগ্রাম ও কালী দুর্গাপূজা পরিত্যাগ করিয়াই মনে করিয়াছিলাম যে, আমরা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখি অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি এমন অনেক পুতুল আছেন, ইহাঁদের হাত পা শরীর নাই, তথাপি ইহাঁরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। ইহাঁদের শক্তি সকলেই অনুভব করিতেছে। বৈদিকদিগের এই বিশ্বাস যে, ইহাঁদিগকে তুষ্ট করিতে না পারিলে, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে, সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে, বায়ুর প্রবল ঘূর্ণায়মান ঝড়ে সৃষ্টি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাঁদের তুষ্টিতেই জগতের তুষ্টি। ইহাঁদের কোপেতে জগতের বিনাশ। অতএব বেদেতে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য আরাধ্য দেবতা হইয়াছেন। কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, ইহাঁরা সব তন্ত্র পুরাণের আধুনিক দেবতা। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য, ইহাঁরা বেদের পুরাতন দেবতা এবং ইহাঁদের লইয়াই যাগ যজ্ঞের মহা আড়ম্বর। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের পোষক যে বেদ, তাহা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আমরা বেদ পরিত্যাগ করিয়া বেদসন্ন্যাসী গৃহস্থ হইলাম। আমাদের গৃহ-কর্ম্মেতেও বেদবিহিত অগ্নির আর আধিপত্য রহিল না। কিন্তু পূর্ব্বকার ব্রহ্মবাদী ঋষিরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতেন। তাঁহারা যাগ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, জ্ঞানের বিরোধী এই যাগ যজ্ঞের আড়ম্বরে বিরক্ত এবং মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া একেবারে বনে চলিয়া গেলেন। অরণ্যের মধ্যে যাইয়া পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেই যুক্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়-গোচর যে দেবতা, তাহার উপাসনা হইতে বিরত হইলেন। উপনিষৎ সেই অরণ্যের উপনিষৎ। অরণ্যেতেই তাহার প্রণয়ন,

অরণ্যেতেই তাহার উপদেশ, অরণ্যেতেই তাহার শিক্ষা। গৃহেতে ইহার পাঠ পর্য্যন্ত নিষেধ। আমরা প্রথমেই এই উপনিষৎ পাইয়াছিলাম।

কিন্তু প্রাচীন ঋষিদেরও আত্মা যে, কেবল এই অগ্নি বায়ু প্রভৃতি পরিমিত দেবতার যাগ যজ্ঞ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, তাহাও নয়। তাঁহাদের মধ্যেও জিজ্ঞাসা হইল যে, এই দেবতারা কোথা হইতে আইলেন? তাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টির প্রহেলিকা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহারা বলিলেন, "কে ঠিক্ জানে, কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি? কেবা এখানে বলিয়াছে যে, কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে? দেবতারা এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, তবে কে জানে যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুতআজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব"॥ ঋষিরা যখন এই সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারিলেন না, যখন তাঁহারা শান্তিহীন হইয়া বিষাদ-অন্ধকারে মুহ্যমান হইলেন, তখন তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া একাগ্রমনে জ্ঞানময় তপঃসাধনে রত হইলেন। তখন দেব দেব পরম দেবতা সেই একাগ্রমনা স্থিরবুদ্ধি ঋষিদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হইয়া মন ও বুদ্ধির অতীত সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন, ইহাতে ঋষিরা জ্ঞানতৃপ্ত ও প্রহৃষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কোথা হইতে এই সৃষ্টি এবং কে এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। তখন তাঁহারা উৎসাহ সহকারে ঋগ্বেদের এই মন্ত্র ব্যক্ত করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে "মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত আবাত-প্রাণিত সেই এক জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎ ছিল না। "মৃত্যুরাসীদমৃতং নতর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং

স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥” যে যে ঋষিরা তপ-প্রভাবে দেব-প্রসাদে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই প্রকারে তাঁহার সত্য বলিয়া গিয়াছেন। যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, যাঁহার বিধানকে বিশ্বসংসার উপাসনা করে, দেবতারাও যাঁহার বিধানকে উপাসনা করেন; অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া, তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে আমরা হবি দান করিব। “য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্যচ্ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম”। তাঁহাকে তোমরা জানিলে না, যিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অন্যকে জানিলে না, যিনি তোমাদের অন্তরে রহিয়াছেন। কেমন করিয়াই বা ইহাঁরা জানিবেন, যখন অজ্ঞান-নীহারের দ্বারা ও বৃথা জল্পনা দ্বারা প্রাবৃত হইয়া, ইন্দ্রিয় সুখে তৃপ্ত হইয়া এবং যজ্ঞের মন্ত্রে অনুশাসিত হইয়া ইহাঁরা সকলে বিচরণ করিতেছেন। “নতং বিদাথ যইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি। দেখ, প্রাচীন ঋক্ ও যজুর্ব্বেদেতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মের তত্ত্ব কেমন উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে। আশ্চর্য্য যে, উপনিষদের যে সকল মহাবাক্য, তাহা সেই প্রাচীন বেদেরই মহাবাক্য—সেই সকল বাক্যেতেই উপনিষদের মহত্ত্ব হইয়াছে। উপনিষদে যে আছে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, উপনিষদে যে আছে “দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া”—এ সকলি ঋগ্বেদের বাক্য—ঋগ্বেদ হইতে উপনিষদে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। বেদের যদি আর সকলি লোপ হয়, তবু এই সকল সত্য বাক্যের কখন লোপ হইবে না। এই সত্যের স্রোত প্রবাহিত হইয়া উপনিষদের ঋষিদের জীবনকে প্লাবিত, পবিত্র ও উন্নত করিল। তাঁহাদের জীবন এই সকল সত্যে সংগঠিত হইল। তাঁহারা ইহা হইতে অমৃতের আস্বাদ পাইলেন এবং মুক্তির পথে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা এই সকল সত্যের প্রভাবে মুক্ত হৃদয়ে বলিলেন—"বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ॥ আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই"। আমি জানিলাম যে, ইহাই পরা বিদ্যা এবং এই পরা বিদ্যার বিষয় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানি টল্‌মল্‌ করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কতদিন চলে। এই সময়ে এক দিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল। সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানির হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল—আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল। ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর। প্রধান কর্ম্মচারী ডি, এম, গর্ডন সাহেবের পরামর্শে সমস্ত পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া একটা সভা করা গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয় তল গৃহে উহাঁরা সকলে সমবেত হইলেন। ডি, এম, গর্ডন আমাদের দেনা পাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত করিলেন। সেই হিসাবে দেখান হইল যে, আমাদের হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা—পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। তিনি সভার সম্মুখে বলিলেন যে, "হাউসের অধিকারীরা আপনার আপনার নিজের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাও ইহাতে দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং ইহাঁদের জমীদারীর স্বত্ব, সকলি আপনারদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন; কিন্তু একটি ট্রষ্ট-সম্পত্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী

নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না"। গর্ডন এইরূপ বক্তৃতা করিতেছেন, আমি গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম—"গর্ডন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের ট্রষ্ট-সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, যদিও আমাদের দেনার দায়ে ট্রষ্ট-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা এই ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাহাতে আমরা পিতৃ-ঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি সেই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে ট্রষ্ট-সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে"। এদিকে পাওনাদারেরা কতকগুলা সম্পত্তির উপরে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা অনতি-বিলম্বেই শুনিলেন যে, কোন আইন আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অকাতরে ট্রষ্ট-সম্পত্তির সহিত আমাদের সকল সম্পত্তিই তাঁহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলাম, আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক সহৃদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল। আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখি-লেন যে, এই হাউসের উত্থান ও পতনে আমাদের কোন হস্ত নাই। আমরা নির্দ্দোষ ও নিরীহ। আমাদের মস্তকে এই অল্প বয়সে এই দারুণ বিপদ পড়িল। আজ আমাদের এই ঐশ্বর্য্য বিভব, কাল আর ইহার কিছুই আমাদের থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। কোথায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন, না, তাঁহারা দয়ার্দ্র হৃদয় হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোথা হইতে দয়া আইল? তিনিই ইহাঁদের মনে দয়া

প্রেরণ করিলেন যিনি আমার চিরজীবন সখা। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, যখন, ইহাঁরা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইহাঁদের সম্পত্তি* হইতে ভরণ পোষণের জন্য ইহাঁরা প্রতি বৎসর ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। দেনাদার পাওনাদার-দিগের মধ্যে এইরূপে একটা সদ্ভাব রহিয়া গেল। কেহ আর তখন আপনার পাওনার জন্য আদালতে নালিশ আনিলেন না। আমা-দের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিষয় চালাইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার বেতন এক হাজার টাকা হইল। তাঁহার অধীনে আরও কর্ম্মচারী থাকিল। এখন হইতে কার-ঠাকুর কোম্পানী "ইন্‌লিকুইডেশন" নামে তাঁহাদের কার্য্য চলিতে লাগিল।

আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনাদারেরা আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। আমরা দুই ভাই বাড়ী চলি-লাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম— "আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম"। তিনি বলি-লেন—হঁা, এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই—তাহারা বলুক যে, ইহঁারা সকল ধন দিলেন, "সর্ব্ববেদসং দদৌ"। আমি বলিলাম যে, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম।—এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব

না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইন্‌সল্‌বেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়। এই সকল কথা বার্ত্তায় আমরা বাড়ী পঁহুছিলাম।

আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেস মিলে গেল—

دران هوا كه جز برق اندر طلب نباشد
گر خرمنى بسوزد چندے عجب نباشد

"সেই অভিলাষে, বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক—যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জ্বলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নহে।" বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক, বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আমি বলি যে, "হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।" তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। "ডুমড়ীকি ঠুডিডয়া ময়েস্সর নহী কে চিবাকে পানি পিয়ুঁ"। যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর এক দিন। আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ি ঘোড়া সব নিলামে দিলাম—খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম—ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব

করিল। “হে ঈশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি”।

এই সময়ে আমি সকালে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর দর্শন শাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেদ, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় ও বাঙ্গালা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মেরা, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু সাধুরা নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাতে কখন কখন রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত হইয়া যাইত। সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সকলও পরিদর্শন করিতাম। হাউস পতনের তিন চারি মাস পরে গিরীন্দ্র নাথ এক দিন আমাকে বলিলেন যে, “এত দিন চলিয়া গেল কিন্তু ঋণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবেরা বসিয়া মাহিয়ানা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে ঋণ যে পরিশোধ হইবে, তাহা তো আশা করা যায় না। এরূপ করিয়া চলিলে আমাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াও ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। অতএব আমি পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, যদি তাঁহারা সমুদায় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া অল্প ব্যয়ে অনতি-দীর্ঘকালে ঋণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি”। আমি বলিলাম যে, এ তো বড় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। পরে আমরা পাওনাদারদিগের সভাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। তাঁহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন। তাহার পরে কাজ কর্ম্ম চালাইবার ভার আমরা নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদের বাড়ীতেই আফিস উঠাইয়া আনিলাম এবং সেই আপিসে

এক জন সাহেব ও এক জন কেরাণী নিযুক্ত করিলাম। এখন আমাদের বাড়ীতে বসিয়াই কার-ঠাকুর কোম্পানীর ঘুড়ীর লক্ গুটাইতে লাগিলাম। মধ্য পথে এখন তাহা না ছিঁড়িলে হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

চারি জন ছাত্রকে যে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডুক, ছান্দোগ্য, তলবকার, শ্বেতাশ্বতর, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ ; বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত ও ছন্দ ; বেদান্ত দর্শন বিষয়ে সটীক সূত্রভাষ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণমালা, সিদ্ধান্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটীক গীতা-ভাষ্য ; কর্ম্ম মীমাংসার মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আইলেন। অপর তিন জনের মধ্যে ঋগ্বেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত রমা নাথ ভট্টাচার্য্যের ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায় ও তাহার ভাষ্যের প্রথমাষ্টকের ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মাধ্যন্দিন সংহিতার একত্রিংশৎ অধ্যায়, তৈত্তিরীয় সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়, কাণ্বভাষ্যের পূর্ব্বার্দ্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং তাহার উত্তরার্দ্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় শিক্ষা হইয়াছে। সামবেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত তারক নাথ ভট্টাচার্য্যের সামবেদ বিষয়ে বেয়গানের ষট্‌-ত্রিংশৎ সাম, আরণ্যগানের চতুর্থ প্রপাঠক, উহগানের সপ্তমার্দ্ধ ও উত্তর ভাষ্যের ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সূক্ত-ভাষ্য এবং কর্ম্মমীমাংসা ; দর্শন বিষয়ে শাস্ত্র দীপিকার জাতি খণ্ডন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইয়াছে। ইহাঁ-দিগের মধ্যে আনন্দ চন্দ্রকে শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠা-বান দেখিয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম। এখন বেদ আলোচনা করিয়া আমার আরও বোধ হইল, ঋষিরা যে, কেবল প্রকৃত চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নিকে উপাসনা করিতেন তাহাও নহে। তাঁহারা সেই এক

পরমেশ্বরকেই অগ্নি বায়ুরূপে বহুপ্রকারে উপাসনা করিতেন। তাই ঋগ্বেদে দেখা যায়—"একং সদ্বিপ্রাবহুধাবদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"। ঋষিরা সেই এক পরমেশ্বরকে অগ্নি, যম, বায়ুরূপে বহুপ্রকারে বলেন। যজুর্ব্বেদেও আছে—"এষ উহ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ"। ইনিই সকল দেবতা। এই বেদবাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঋগ্বেদ অনুবাদের ভূমিকাতে বলিয়াছিলাম যে "সূর্য্যের অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ, তিনি সূর্য্যদেবতা। বায়ুর অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ, তিনি বায়ুদেবতা। অগ্নির অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ, তিনি অগ্নিদেবতা; ইহাতে বৈদিকেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতন্য পুরুষ তাঁহারই উপাসনা করেন"। তন্ত্র পুরাণের দেবতা, আর বেদের দেবতা, ইহাঁদের অনেক প্রভেদ। কিন্তু এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদ জ্ঞান নাই। ইহাদের বিশ্বাস যে, বেদের মধ্যেই কালী, দুর্গা পূজার বিধি আছে। এই সকল ভ্রম দূরীকরণের জন্য এবং আমাদের পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের ক্রম-অভিব্যক্তি জানিবার জন্য কাশীর একজন পণ্ডিতের সাহায্যে আমি ঋগ্বেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। ঋগ্বেদের পূর্ব্বার্দ্ধ-মূল সভায় সংগৃহীত হইয়াছে এবং ভাষ্য যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আপাততঃ বেদ-অনুবাদ নির্ব্বাহ হইতে থাকিবে। কিন্তু এ প্রকাণ্ড কাণ্ড। ইহার সংহিতাতেই দশ সহস্রেরও অধিক শ্লোক। আমি যে, ইহা সমাপ্ত করিতে পারিব, তাহার কোন আশা নাই। তথাপি সাধ্যমত যাহা পারি, তাহাই অনুবাদ করিয়া তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতে মুদ্রিত করিতে লাগিলাম।

এত দিন ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্মোপাসনাতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। এই দুই মহাবাক্য ছিল। ইহা অপূর্ণ ছিল। এখন তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ

হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল। সমাজের উপাসনা প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবার তিন বৎসর পরে ১৭৭০ শকে আমি তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ করিয়া দিই। যিনি আত্মার অন্তর্যামী ব্রহ্ম এবং তাহাতে নিয়ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি। যখন সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ"। সেই জন্ম বিহীন পরমাত্মা বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। আবার তিনি "অনন্তরমবাহ্যং। নিত্যমেবাত্মসংস্থং।" তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন যে, জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রেম মঙ্গলে সকলে উন্নত হউক—তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং"।

সাধকদিগের এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন। যখন তাঁহাকে অন্তরে আমার আত্মাতে দেখি, তখন বলি—"তুমি অন্তরতর অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা"। যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখি, তখন বলি—"তব রাজ সিংহাসন অসীম আকাশে," যখন তাঁহাকে তাঁহার আপনাতে দেখি,—তাঁহার স্বীয় ধামে সেই পরম সত্যকে দেখি, তখন বলি—"তুমি শান্তং শিবমদ্বৈতং" তুমি শান্তভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছ।

আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি, কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের বাহিরে ভাবি, কখনো ভাবি যে, তিনি আপনাতে আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু একই সময়ে সেই অবাতপ্রাণিত নিত্য জাগ্রত

পুরুষ আপনাতে আপনি শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতে-ছেন এবং বহির্জ্জগতে জীবের কাম্যবস্তু-সকল বিধান করিতেছেন। "তাঁর যুগ যুগ একোবেশ"। কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন। "করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি দরশন"। তাঁহার প্রসাদে আমার এখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান—দেখিতে পান যে, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনি পরম যোগী। তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ, মন, প্রীতি, ভক্তি, সকলি তাঁহাতে অর্পণ করেন এবং অপরাজিত চিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন। তিনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে ১৭৭০ শকের আশ্বিন মাসে কতকগুলি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আমি দামোদর নদীতে বেড়াইতে যাই। সাত দিন সেই দামোদরের বাঁক ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক দিন বেলা চারিটার সময় তাহার তীরের একটা চড়ায় নৌকা লাগাইলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে, বর্দ্ধমান ইহার খুব নিকটে, দুই ক্রোশ দূরে। অমনি আমার বর্দ্ধমান দেখিতে কৌতূহল হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা হইতে নামিয়া দুই ক্রোশ চড়া ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান চলিলাম। রাজ নারায়ণ বসু আর দুই এক জন আমার সঙ্গে। সহরে পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, জ্বলিতেছে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইয়া সহর দেখিলাম, বাজার দেখিলাম, রাজবাড়ী দেখিলাম। রাজবাড়ীর মধ্যে বাতির আলোকে আলোকিত একটা ঘরে রাজা যেন বসিয়া আছেন, শাশীর বাহির হইতে আমাদের এমনি বোধ হইল। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করিয়া আবার দামোদরের সেই চড়া ভূমি দিয়া নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। রাজ নারায়ণ বাবু এত পর্য্যটন বোধ হয় কখনো করেন নাই। আমাদের সঙ্গে তিনি আর চলিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক কষ্টে নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন; দেখি, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। পর দিন বেলা প্রথম প্রহরে তরুণ সূর্য্য-রশ্মি-বিধৌত সেই দামোদরের পুণ্য-স্রোতে স্নান করিয়া নীল পট্ট-বস্ত্র পরিধান করিলাম এবং নিয়মিত উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। এমন সময়ে দেখি, সেই চড়া ভাঙ্গিয়া এক খানা সুন্দর ফিটেন গাড়ী চারিদিকে বালুর মেঘ তুলিয়া আসিতেছে। যেখানে উষ্ট্রের পথ সেখানে কি ভাল গাড়ি

চলিতে পারে, না ঘোড়া দৌড়িতে পারে? আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, এমন স্থান দিয়া ইহারা কোথায় যাইতেছে। দেখি যে, সে গাড়ি আমার বোটের সম্মুখে দাঁড়াইল। কৌচ বাক্স হইতে এক জন লাফাইয়া পড়িল, সে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি চাও? সে যোড় করে আমাকে বলিল যে, "বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া এই গাড়ি পাঠাইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন"। আমি বলিলাম, এখন্ আমি নদী, বন, পাহাড়, পর্ব্বত দেখিতে বাহির হইয়াছি; এখন্ আমি কোথায় রাজদর্শন করিতে যাইব? আমি এই নদী দিয়া আসিয়াছি, এই নদী দিয়াই ফিরিয়া যাইব। আমি আর ডাঙ্গায় উঠিব না। সে বলিল যে, "আমি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে মহারাজের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হইব। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। একবার রাজাকে দর্শন দিন। আপনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিলে আপনি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি আপনাকে না লইয়া, যাইব না"। তার এত কাতরতা ও মিনতি দেখিয়া আমি যাইতে স্বীকার করিলাম। আমি ভোজন করিয়া দুই প্রহরের পর বর্দ্ধমানে চলিলাম, যখন পঁহুছিলাম, তখন বেলা অবসান হইয়াছে। নানা উপকরণে সুসজ্জিত একটি বাসস্থান আমার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা আমাকে ঘেরিয়া বসিল, তাঁর গোবিন্দ বাঁড়ুর্য্যে, কীর্ত্তি চাটুর্য্যে সকলেই আমার কাছে হাজির। আমার বাসা হইতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত, আমি কি করিতেছি, কি বলিতেছি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই সংবাদ লইবার জন্য, ডাক বসিয়া গেল। পর দিন প্রাতে তিন চারি খানা গরুর গাড়ি করিয়া চাল, ডাল, ময়দা, সূজী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী আমার বাসাতে আসিয়া উপস্থিত। আমি লোকদের

জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এত জিনিস কেন? তাহারা বলিল যে, রাজগুরুর জন্য যে সিধা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সিধা আপনাকে মহারাজ পাঠাইয়াছেন। তাহার পরে দুই প্রহরের সময় জুড়ি আসিয়া আমার দরজায় দাঁড়াইল। আমি সেই গাড়ীতে চড়িয়া রাজ বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন, সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমিও তাঁহার বিলিয়ার্ড খেলার আমোদে যোগ দিলাম। তিনি আমাকে ধরিয়া একটা উচ্চ আসনে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার নম্রতা বিনয় ও অনুরাগ দেখিয়া আমারও অনুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। আমার সহিত এই প্রকারে তাঁহার সম্মিলন হইল এবং ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। তিনি আমার পরামর্শে রাজ বাড়ীর মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। এই ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর কার্য্যের এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য আমি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে এবং তারক নাথ ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। ইহার পর আমি সর্ব্বদাই বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতাম এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতাম। তিনিও আমাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার জন্মোৎসবে, তাঁহার বনভোজনে যখন যে উপলক্ষে সেখানে যাইতাম, আমার সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা হইতেই হইত। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। এক রাত্রিতে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে তিনি বক্তৃতা করিলেন—"আমি কি অকৃতজ্ঞ! তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন, আমি তাহার জন্য তাঁহার কাছে যথোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত কত দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহার কাছে কতই কৃতজ্ঞ হয় তাঁহাকে পূজা করে আমি কি অকৃতজ্ঞ!

কি অধম !” এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি আমাকে তাঁহার অন্তঃপুরেই লইয়া গেলেন। সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে, আমাকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, “আমরা এইখানে বসিয়া মাছ ধরি”। উপরে দোতালায় লইয়া গেলেন—দেখি, সেখানে জরির মছ্‌নদ্‌ পাতা বিবাহের বাড়ীর সজ্জার মত সব সাজান। তিনি বলিলেন “এইখানে আমরা বসি।” আর একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, “এখান হইতে রাণী আমার বিলিয়ার্ড খেলা দেখিতে পান।” তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার বোধ হইল যে, রাজা যেমন রাণীর প্রতি সন্তুষ্ট, রাণী তেমনি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট। “সন্তুষ্টো ভার্য্যয়াভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ”। এক দিন রাজা আমাকে বলিলেন—“আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে”। আমি ভাবিলাম, না জানি কিই বলিবেন। আমি বলিলাম কি প্রার্থনা? তিনি বলিলেন “আপনাকে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বসিতে হইবে—আপনার একটা ছবি লইব”। তাঁহার বাড়ীতে তখন এক জন ভাল কারু ইংরাজ আসিয়াছিল, সে আমার ছবি লইল। আমার তখনকার সেই ছবি এখনো তাঁহার ঘরে আছে। রাজা মহাতাব চাঁদ আর নাই, তাঁহার পুত্র আবতাব চাঁদও অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজ এখনো রহিয়াছে। সেখানে অদ্যাপি এক জন উপাচার্য্য প্রতিনিয়ত ব্রহ্ম নাম ধ্বনিত করেন, কিন্তু তাঁহার কেহ শ্রোতা নাই। সেই শূন্য সমাজ গৃহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাই তাহার একমাত্র দীপ।

এক দিন কলিকাতায় আমি গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেছিলাম, এক জন আসিয়া সেই পথে আমার হাতে একখানা পত্র দিল। খুলিয়া দেখি, সে পত্র কৃষ্ণ নগরের রাজা শ্রীশ চন্দ্রের। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন যে “কল্য পাঁচটার সময় টাউন হলে

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব"। আমি তাহার পর দিন পাঁচটার সময় টাউন হলে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছি, একটু পরে তিনি আসিয়া আমাকে দেখা দিলেন। পরস্পরের সম্মিলনে বড়ই সুখী হইলাম। সেখানে তিনি আমার সহিত কেবলই ধর্ম্মালোচনা করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে "এখানে এত অল্পক্ষণে আলাপ করিয়া মনের পরিতৃপ্তি হইল না। আমি কলিকাতায় এখনো তিন চারি দিন আছি, যদি ইহার মধ্যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় যাইয়া আলাপ করেন তবে বড় সুখী হই"। তিনি প্রকাশ্যে আমার সহিত দেখা করিতে সঙ্কোচিত। আমি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, ব্রাহ্ম; আর তিনি নবদ্বীপাধিপতি পৌত্তলিক সমাজের কর্ত্তা। আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম আলাপ, তিনি আপনিই আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কৃষ্ণ নগরে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া আমি সর্ব্বদাই সেখানে যাইতাম। তিনি লোকমুখে আমার কথা শুনিয়া, আমার বক্তৃতাদি পড়িয়া, আমার সহিত আলাপ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসাতে গেলাম। আমাকে তিনি তাঁহার দোতালার ছাদের উপরে নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি দীপও নাই। গিয়াই তিনি অমনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সেখানে মাটিতে বসিলাম। বেস ফকিরী ভাব হইয়া গেল। তিনি বলিলেন— "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষ্যঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"। তাঁহার অমায়িকতা ও সরলতা দেখিয়া তাঁহার সহিত আমার বড়ই সদ্ভাব জন্মিয়া গেল—আমরা এক হৃদয় হইয়া গেলাম। বিদায় পাইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে "এবার কৃষ্ণ নগরে যখন যাইবেন, তখন এক রাত্রি আমার বাড়িতে গিয়া থাকিতে হইবে—থাকিবেন

কি ?” আমি বলিলাম যে, ইহা হইতে আহ্লাদ ও সৌভাগ্য আর কি আছে ? আমাকে আপনি যখনি ডাকিবেন তখনি যাইব। তাহার পরে আমি কৃষ্ণ নগরে গেলে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমি সন্ধ্যার সময় তাঁহার রাজ বাটীতে গেলাম। তিনি আমাকে একটি নিভৃত সুন্দর কুঠরিতে লইয়া বসাইলেন। সেখানে আর কেহ নাই। কেবল তাঁহার পুত্র সতীশ চন্দ্র আছেন। আমাদের আমোদের জন্য তাঁহার ধ্রুপদ সকল শুনাইলেন। দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত গানই চলিল। ষাট্ প্রকারের ব্যঞ্জন দিয়া আমাকে ভোজন করাইলেন। তাঁহার বাড়ীতে শয়ন করিলাম। খুব ভোরে রাজা আপনি আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং তাঁহার পূজার বাড়ী দেখাইয়া প্রভাতেই আমাকে বিদায় দিলেন।

সেই সময়ে ধর্ম্মযোগে এই দুইটি রাজার সহিত আমার যোগ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক জন প্রকাশ্যে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক জন খুব গোপনে কিন্তু খুব অন্তরে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে মোট ১১ খানি উপনিষৎ আছে এবং তাহা শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন। এখন দেখি, শঙ্করাচার্য্য যাহার ভাষ্য করেন নাই এমন অনেক উপনিষৎ আছে। অণ্বেষণ করিয়া দেখিলাম যে, ১৪৭ খানি উপনিষৎ রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন, সেইগুলিই প্রামাণ্য। তাহাতেই ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্মোপাসনা, এবং মুক্তির সোপানের উপদেশ আছে। সকল শাস্ত্রের মধ্যে এই উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ বলিয়া এবং সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া যখন সর্ব্বত্র মান্য হইল, তখন বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়গণ উপনিষৎ নাম দিয়া গ্রন্থ প্রচার করিতে লাগিল এবং তাহাতে পরমাত্মার পরিবর্ত্তে আপন আপন দেবতাদের উপাসনা প্রচার করিতে লাগিল। তখন গোপাল তাপনী উপনিষৎ প্রস্তুত হইল। তাহাতে পরমাত্মার স্থান শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করিলেন। সেই গোপাল তাপনী উপনিষদে মথুরাকে ব্রহ্মপুর এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার একটা গোপীচন্দনোপনিষৎ আছে। তাহাতে কেমন করিয়া তিলক কাটিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। বৈষ্ণবেরা এইরূপে আপনাদের দেবতার মহিমা ঘোষণা করিল। আবার শৈবরা স্কন্দোপপনিষৎ নাম দিয়া আর এক গ্রন্থে শিবের মহিমা ঘোষণা করিল। সুন্দরী তাপনী উপনিষৎ, দেবী উপনিষৎ, কৌলোপনিষৎ প্রভৃতিও আছে। তাহাতে কেবল শক্তির মহিমা প্রচার। এমন কি উপনিষদের নামে যে কেহ, যাহা তাহা প্রচার করিতে লাগিল। আকবরের সময়ে হিন্দুদের মুসলমান করিবার জন্য আবার একটা উপনিষৎ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার নাম আল্লোপনিষৎ। কি

আশ্চর্য্য! উপনিষদের এই কণ্টকারণ্য আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না, কেবল একাদশ উপনিষদই আমরা পূর্ব্বে জানিতাম এবং সেই সকল উপনিষদেরই সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সকল উপনিষদ্‌কেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন এ ভিত্তি ভূমিকেও দেখি যে, সে বালুকাময় এবং শিথিল, এখানেও মৃত্তিকা পাই না। প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না, তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষৎ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। যখন শঙ্করাচার্য্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্ত দর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তখন আর তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না। আমাদের ধর্ম্ম-পোষণের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, বেদান্ত দর্শনকে ছাড়িয়া কেবল একাদশ উপনিষৎকে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা পাইব, এইজন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সমস্ত উপনিষদের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম—"সোঽহমস্মি" তিনিই আমি "তত্ত্বমসি" তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম। এই উপনিষৎ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না—হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি! ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তন-ভূমি হইল না—উপনিষদেও তাহার পত্তন-ভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তন-ভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি। সেই হৃদয়ের

সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষৎ তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল। উপনিষদেও আছে "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ"। হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন। নিষ্পাপ প্রশান্তহৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাবে বুদ্ধির আলো পড়িয়া যে মন উজ্জ্বলিত হয়, সেই মনের দ্বারা ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন। পূর্ব্বকার যে ঋষি জ্ঞানপ্রসাদে ধ্যান-যোগে আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্মকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারই পরীক্ষিত কথা এই যে—"জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়-মানঃ"। আমারও হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এই কথার মিল হইল, অতএব আমি এই কথা গ্রহণ করিলাম। আবার যখন দেখিলাম, উপনিষদে আছে যে, যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়-নের মাস সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয়, এবং সেই চন্দ্র-লোকে স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবী-লোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্র-লোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়—তাহারা এখানে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়। সেই ব্রীহি, যব, তিল, মাষাদি অন্ন, যে, যে ভক্ষণ করে সেই সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তখনি এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা

বলিয়া বোধ হইল। তাহাতে আর আমার হৃদয় সায় দিতে পারিল না। সে আমার হৃদয়ের অনুবাদ নহে। কিন্তু উপনিষদের এই মহাবাক্যে সম্পূর্ণরূপে আমার হৃদয় সায় দিল। "আচার্য্য কুলাদ্বেদমধিত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ত্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ সখল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে"। আচার্য্যকুলে বেদ অধ্যয়ন ও যথাবিধি গুরুসেবা সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিবাহের পর পবিত্র স্থানে বেদ অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিক পুত্র শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কোন প্রাণীর পীড়াদায়ক না হয় এরূপ ন্যায়-উপার্জ্জিত বিত্তের দ্বারা জীবনধারণ করিবেক। যিনি এইরূপে যাবদায়ু ইহলোকে জীবন যাপন করেন, তিনি মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তিনি আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করেন না, তিনি আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করেন না। যে ব্যক্তি ইহলোকে থাকিয়া ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে আত্মাকে পবিত্র করে, সে পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়া পুণ্য-লোকে গমন করে এবং পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া দেব-শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই পুণ্য-লোকে ঈশ্বরের জাজ্জ্বল্যতর মহিমা দেখিয়া এবং জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্মে আরো উন্নত হইয়া তথা হইতে উন্নততর লোকে তাহার গতি হয়। এই প্রকারে উন্নতি হইতে উন্নতি লাভ করিয়া পুণ্য-লোক হইতে পুণ্যলোকে—অসংখ্য স্বর্গ হইতে স্বর্গলোকে গমন করিতে থাকে, "এষ দেবপথো পুণ্যপথঃ" এই পৃথিবীতে তাহার আর পুনরাগমন হয় না। স্বর্গলোকে পশুভাব নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই; সেখানে স্ত্রী-ঐষণা বিত্তৈষণা নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই। সেখানে চির জীবন, চির যৌবন।

এইরূপ স্বর্গ হইতে স্বর্গ-লোকে জ্ঞানের, প্রেমের, ধর্ম্মের ও মঙ্গলের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সেই দেবাত্মাকে অনন্ত উন্নতির অভিমুখে লইয়া যায় এবং আনন্দের উৎস তাঁহার হৃদয় হইতে নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে। কঠোপনিষদের উপাখ্যানে নচিকেতা মৃত্যুর নিকটে স্বর্গের এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন—"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি উভে তীর্ত্বা অশনায়া পিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে।" স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, সেখানে তুমি নাই—অর্থাৎ মৃত্যু নাই, সেখানে জরা নাই। ক্ষুৎপিপাসা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এবং শোককে অতিক্রম করিয়া সেই দেবাত্মা স্বর্গলোকে আনন্দেই থাকেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করে সেই পাপীর গতি কি হয়? যে এখানে পাপ করিয়া সেই কৃত পাপের জন্য অনুতাপ না করে ও তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপাচরণই করিতে থাকে, মৃত্যুর পরে তাহার পাপ-লোকেই গমন হয়। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকন্নয়তি পাপেন পাপং"। পুণ্যদ্বারা পুণ্য-লোকে ও পাপদ্বারা পাপ-লোকে নীত হয়। এই বেদ বাক্য। পাপের তারতম্য অনুসারে তদুপযুক্ত পাপ-লোকে যাইয়া সেই পাপীর আত্মা পাপাশ্রিত দেহ ধারণ করে এবং সেখানে নিয়ত কুটিল পাপের অনুতাপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে যখন তাহার পাপ-সকল নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং যখন তাহার প্রায়শ্চিত্তের অবসান হয়, তখন সে প্রসাদ লাভ করে। সে পৃথিবীতে যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল সেই সঞ্চিত পুণ্য-বলে তখন সে উপযুক্ত পুণ্য-লোকে গমন করে এবং সেখানে পশুভাবের বিপরীত দেব-শরীর ধারণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে থাকে। সেখানে থাকিয়া সে যে পরিমাণে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পুণ্য সঞ্চয় করিবে, তদনুসারে আরো উন্নত লোকে গমন করিবে এবং সেই দেব-পথের, পুণ্য পথের যাত্রী হইয়া অগণ্য স্বর্গ-

লোক হইতে স্বর্গলোকে উন্নত হইতে থাকিবে। ঈশ্বরের প্রসাদে আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল—পাপ তাপ অতিক্রম করিয়া এই উন্নতিশীল আত্মার উন্নতিই হইবে। পৃথিবীতে আর তাহার অধঃপতন হইবে না। ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে পাপের কখন জয় হয় না। মানব শরীরে আত্মার প্রথম জন্ম, মৃত্যুর পরে সে পাপ পুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত উপযুক্ত শরীর ধারণ করিয়া লোকলোকান্তরে সঞ্চরণ করিতে থাকিবে, তাহার আর এখানে পুনরাগমন হইবে না। আবার যখন উপনিষদে দেখিলাম, ব্রহ্মোপাসনার ফল নির্ব্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় প্রদর্শন করিল। "কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বএকী ভবন্তি"। কর্ম্ম সকল এবং বিজ্ঞানময় আত্মা অব্যয় পরব্রহ্মে সকলই এক হয়—ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, বিজ্ঞানাত্মার আর পৃথক সংজ্ঞা থাকে না, তবে ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে—ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় এই নির্ব্বাণমুক্তি! উপনিষদের এই নির্ব্বাণমুক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না। এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ উন্নতলোক স্বর্গেতেই থাকুক কিম্বা এই অধঃস্থ পৃথিবীতেই থাকুক, যখন তাহার সমুদায় বিষয়কামনার পরিসমাপ্তি হইয়া একমাত্র অন্তর্যামী পরমাত্মাকে লাভ করিবার কামনা অহোরাত্র হৃদয়ে জাগিতে থাকে, যখন সে আপ্তকাম ও আত্মকাম হয়, সে অবস্থায় যখন তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ থাকিয়া, সহিষ্ণু হইয়া, তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সকল সে সাধন করিতে থাকে, তখন সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সংসারের পার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্তরতম অমৃত ব্রহ্মের তিমিরাতীত জ্ঞানোজ্জ্বল প্রেমসিক্ত ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে নূতন প্রাণ পাইয়া, পবিত্র হইয়া, তাঁহার কৃপাতে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে, সেই অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, আনন্দের সহিত ছায়া ও আতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত থাকে। সে দিনের

আর অবসান হয় না। "সকৃৎ বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ"। এই, ইহার পরম গতি, এই, ইহার পরম সম্পৎ, এই, ইহার পরম লোক, এই, ইহার পরম আনন্দ। "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ"। বেদের এই মহাবাক্যে জ্ঞান তৃপ্ত হয়, আত্মা শান্তিলাভ করে এবং হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে থাকে "ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং"।

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মমচিত্ত আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি।
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে নব সুখ, নব প্রাণ, নবদিবা আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে।
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি, কে রহিবে আর দূর পরবাসে।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

এইক্ষণে তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ আমার হৃদয়ে আসিয়া পঁহুছিয়াছে—"স্বস্তিবঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" এই অজ্ঞানান্ধকার সংসারের পরকূলে ব্রহ্মলোকে যাইবার পথে তোমাদের নির্ব্বিঘ্ন হউক। এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এই পৃথিবী হইতেই শাশ্বত ব্রহ্মলোককে অনুভব করিতেছি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার এখন ভাবনা হইল যে, ব্রাহ্মদের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত উপনিষৎ কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন একটি বীজ মন্ত্র চাই যে, সেই বীজ-মন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম। বলিলাম—আমার আঁধার হৃদয় আলো কর। তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম, অমনি একটি পেন্‌সিল দিয়া সম্মুখের কাগজ খণ্ডে তাহা লিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি একটা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক আমার বয়স্‌ ৩১ বৎসর। বীজতো এইরূপে বাক্সের মধ্যে রহিলেন। এখন আমি ভাবিতে লাগিলাম, ব্রাহ্মদিগের জন্য একটা ধর্ম্মগ্রন্থ চাই। তখনি আমি অক্ষয় কুমার দত্তকে বলিলাম যে, তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো এবং আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাক। এখন আমি একাগ্র চিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্য-সকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম এবং অক্ষয় কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি সতেজে বলিলাম "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি"। ব্রহ্মবাদীরা বলেন। ব্রহ্মবাদীরা কি বলেন? "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"।

যাঁহা হইতে এই শক্তি বিশিষ্ট বস্তু সকলের সহিত প্রাণী জঙ্গম জীব জন্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। তাহার পর আমার হৃদয়ে এই সত্য আবির্ভূত হইল যে, ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ। আমি অমনি বলিলাম—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"। আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়,— উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। আমি দেখিলাম যে, পূর্ব্বে কেবল এক অজ-আত্মা পরব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। অমনি বলিলাম, "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সবা এষ মহানজ আত্মা-ঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ"। এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনিই এই জন্মবিহীন মহান্ আত্মা। তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। আমি দেখিলাম যে, তিনি দেশ, কাল, কার্য্যকারণ, পাপ পুণ্য কর্ম্মের ফল সকলি আলোচনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। "সতপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"। তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। আমি দেখিলাম, তাঁহারি অনু-শাসনে সকলি শাসিত হইয়া চলিতেছে। বলিলাম—"ভয়াদস্যাগ্নি-

স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ”। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, বায়ু ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পর পর বলিতে লাগিলাম। সর্ব্বশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলাম—“যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়”। এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। এই প্রকারে আমি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বর প্রসাদে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়া গেল *। কিন্তু ইহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে এবং তাহা আয়ত্ব করিতে আমার সমস্ত জীবন চলিয়া যাইবে, তথাপি তাহার অন্ত হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল সত্য-বাক্যে আমার অটল শ্রদ্ধা হউক, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের নিকটে এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইহাতে আমার পরিশ্রমের ঘর্ম্ম-বিন্দু নাই, কেবলই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। কে আমার হৃদয়ে এই সত্য-সকল প্রেরণ করিলেন? “ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ” যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই জাগ্রৎ জীবন্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহ-বাক্যও নহে, প্রলাপ

---

* ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অনেক দিন পরে তাহার তাৎপর্য্য লিখিত হয়।

বাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাঁহা হইতেই এই জীবন্ত সত্য-সকল আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন আমি তাঁহার পরিচয় পাইলাম। আমি জানিলাম যে, তাঁহাকে যে চায়, সেই তাঁহাকে পায়। আমার কেবল এক মনের টানে তাঁহার পদ-ধূলি লাভ করিলাম এবং সেই ধূলি আমার নেত্রের অঞ্জন হইল। লেখা হইয়া গেলে তাহা আমি ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম *। প্রথম অধ্যায়ের নাম আনন্দ-অধ্যায় হইল। এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ—ব্রাহ্মী উপনিষৎ প্রস্তুত হইল। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমখণ্ডের শেষে লেখা আছে—"উক্তাতউপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাবতউপনিষদমব্রূমেত্যুপনিষৎ"। তোমার নিকট উপনিষৎ উক্ত হইল, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদই তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ, ইহাই উপনিষৎ। ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষৎকে আমি একবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংশ্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য তাহা লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্প-তরুর অগ্র শাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষৎ—ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ। তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই উপনিষৎ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা করিতে

---

* ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বহুদিন পরে মসূরী পর্ব্বতবিচরণ সময়ে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং"। উপনিষদের এই শ্লোকটি ইহার ষোড়শ অধ্যায়ে আমি সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলাম।

পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তর খণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়। এই খনি নিহিত সকল স্বর্ণই যে বাহির হইয়াছে তাহাও নহে। বেদ উপনিষৎরূপ খনির মধ্যে এখনো কত সত্য কত স্থানে গভীর রূপে নিহিত আছে। ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধসত্ব সত্যকাম ধীরেরা যখনি অনুসন্ধান করিবেন তখনি ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহাদের হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে এবং তাঁহারা সেই খনি হইতে সেই সত্য-সকল উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মোপাসনার কেহ অধিকারী হইতে পারে না। সেই ধর্ম্ম কি, ধর্ম্ম-নীতি কি ? ইহা ব্রাহ্মদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক এবং সেই ধর্ম্ম-নীতি অনুসারে চরিত্র গঠন করা তাঁহাদের নিত্য কর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্মদের জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন ও উপদেশের প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ পড়িয়া ব্রহ্মকে জানিবে, তেমনি ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই দুই অঙ্গ—একটি উপনিষৎ, দ্বিতীয়টি অনুশাসন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের উপনিষৎ তো সমাপ্ত হইল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনুশাসনের জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, মনু-স্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম এবং তাহা হইতে শ্লোক-সকল সংগ্রহ করিয়া অনুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম। ইহাতে মনুস্মৃতি আমাকে বড়ই সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য স্মৃতিরও শ্লোক আছে, তন্ত্রেরও শ্লোক আছে, মহাভারতের এবং গীতারও শ্লোক আছে। এই অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিতে আমার বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমে ইহাকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভাগ করিয়াছিলাম, পরে এক অধ্যায় ত্যাগ করিয়া ইহাকেও

ষোল অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম। ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই উপদেশ আছে যে, গৃহস্থের তাবৎ কর্ম্মে ব্রহ্মের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে—"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"। গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়—"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ"। গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন। শেষের শ্লোকে গৃহে পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে ব্যবহার করিবে তাহার উপদেশ—"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকাতনুঃ। ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্। তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতা সংজ্বরঃ সদা"। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপা পাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক। "অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ"। পরের অত্যুক্তি-সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না। তাহার পরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পতি এবং পত্নীর মধ্যে পরস্পর কর্ত্তব্য ও ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ। চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্ম্ম-নীতি। পঞ্চম অধ্যায়ে সন্তোষ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সত্য-পালন ও সত্য-ব্যবহার। সপ্তম অধ্যায়ে সাক্ষ্য। অষ্টম অধ্যায়ে সাধুভাব। নবম অধ্যায়ে দান। দশম অধ্যায়ে রিপু-দমন। একাদশ অধ্যায়ে ধর্ম্মোপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে পরনিন্দা নিষেধ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়-সংযম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পাপ-পরিহার। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাক্য, মন এবং শরীরের সংযম। এবং ষোড়শ অধ্যায়ে ধর্ম্মে মতি। ইহার শেষের দুই শ্লোকে আছে—"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমং ক্ষিতৌ। বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তং অনুগচ্ছতি। "তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ। ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্"। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করে, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। "এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যমেব-মুপাসিতব্যম্" ॥ এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক ; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক। যিনি সংযত ও শুচি হইয়া এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ বা শ্রবণ করেন এবং ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া তদনুযায়ী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অনন্ত ফল লাভ হয়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এই প্রকারে ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আবদ্ধ হইল। ইহাতে অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ, মায়াবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রকাশিত হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পর পরস্পরের সখা ও তাঁহারা সর্ব্বদা যুক্ত হইয়া আছেন, "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইহাতে অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, "ন বভূব কশ্চিৎ" "তিনি আপনি কিছুই হন নাই"। তিনি জড় জগৎও হন নাই, বৃক্ষ লতাও হন নাই, পশু পক্ষীও হন নাই, মনুষ্যও হন নাই। ইহাতে অবতার-বাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, "সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" "তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিলেন"। পূর্ণ সত্য হইতে এই বিশ্বসংসার নিঃসৃত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসার আপেক্ষিক সত্য, ইহার স্রষ্টা যিনি তিনি সত্যের সত্য, পূর্ণ সত্য। এই বিশ্বসংসার স্বপ্নের ব্যাপার নহে, ইহা মানসিক ভ্রমও নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। যে সত্য হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে তিনি পূর্ণ সত্য, আর ইহা আপেক্ষিক সত্য। ইহাতে মায়াবাদ নিরস্ত হইল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল না; তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, এখন ইহা একত্র সংক্ষিপ্ত হইল। ইহা অনেক ব্রাহ্মের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল এবং পুণ্য-সলিলে প্লাবিত করিল। যাহার হৃদয় আছে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ তাহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিবেই করিবে। ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনার সময়ে পূর্ব্বে যে বেদপাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ আরম্ভ হইল এবং যে উপনিষৎ পাঠ হইত তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ হইতে লাগিল।

ইহার পর হইতে ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের "অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়। আবিরাবীর্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। এই মন্ত্র লইয়া কেহ বা মূল সংস্কৃত শব্দে কেহ বা তাহার ভাষান্তর অনুবাদে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

গত বৎসর হইতে সমাজগৃহের তেতালা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল, এবৎসরের ১১ই মাঘের পূর্ব্বে তাহা প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি করিতেছি। এবার ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ, নূতন তেতালায় বসিয়া উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে নূতন স্বাধ্যায় পাঠ করিব, নূতন স্তোত্রে আমাদের সেই স্তবনীয়কে উপহার দিব, নূতন সঙ্গীত গান করিব, তাহারই উদ্যোগে আমাদের সপ্তাহ চলিয়া গেল। এই গৃহ সেই ১১ই মাঘেই প্রস্তুত হইল, সমাজগৃহ নূতন বেশ ধারণ করিল। শ্বেত প্রস্তরের বেদী, তাহার সম্মুখে সুসজ্জিত গীত-মঞ্চ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ক্রমোচ্চ কাষ্ঠাসন—সকলি নূতন, সকলি সুন্দর এবং শুভ্র। ঝাড় লণ্ঠনের আলোকে সমস্ত আলোকিত হইল। আমরা বাড়ীর দল বল লইয়া সন্ধ্যার সময় সমাজে উপস্থিত হইলাম। সকলেরি মুখে নূতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ, সকলেই আনন্দে পূর্ণ। বিষ্ণু সঙ্গীত-মঞ্চ হইতে গান ধরিলেন, "পরিপূর্ণমানন্দং" তাহার পরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল, আমরা সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে স্বাধ্যায় পাঠ করিলাম। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকের আবৃত্তি হইল। সকলের শেষে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ" বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইল। সকলে স্তব্ধ হইল, তখন আমি বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রহৃষ্ট মনে ভক্তি-ভরে এই স্তোত্র পাঠ করিলাম।

"হে জগদীশ্বর! সুশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ

মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে ; তাহা একারণে নহে যে, তুমি আমাদিগের কাহারো নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও আমাদিগের সমীপে তুমি জাজ্জ্বল্যতর আছ ; কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকল আমাদিগকে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। "তমসিতিষ্ঠন্ তমসোঽন্তরোযং তমো ন বেদ"। তুমি যেমন অন্ধকারে আছ. সেইরূপ তুমি তেজেতেও আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ ;—তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ ; হে জগদীশ্বর ! তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ। কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে একবারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকেই ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের এ প্রকার অচেতন স্বভাব যে, বিশ্ব-নিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্ নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আছ, তুমি আমাদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমাদিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রম করি ; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠানকে অনুভব করি না। হে পরমাত্মন্ ! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস ! হে পুরাণ অনাদি অনন্ত, সকল জীবের জীবন ! যাহারা আপনারদিগের অন্তরে তোমাকে অনুসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে তাহাদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়, কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান করে ! যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহারা আমাদিগের মনকে এতদ্রূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়

ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প, হ্রসমান্ স্রোত—ভঙ্গুর প্রাসাদ, ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান্ ধাতুর রাশি আমাদিগের মনে প্রতীতি হয়, আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহাদিগকে সুখ-দায়ক বস্তু জ্ঞান করি, কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে, তাহারা আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহাদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমাদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখি-য়াছে। তুমি এতদ্রূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎপদার্থ যে, ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ, তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তুমি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথার-সন্নিত্যমগন্ধবচ্চ"। এই নিমিত্ত যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না,—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা কি দুর্ভাগ্য, আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্য জ্ঞান করি! যাহা কিছুই নহে, তাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব, তাহা আমাদিগের নিকটে কিছুই নহে! এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ-সকল অধস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে পরমাত্মন্! আমি কি দেখিতেছি! তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান্ দেখিতেছি! যে তোমাকে দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই, সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই; তাহার জীবন স্বপ্নস্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী, তোমার জ্ঞান অভাবে

যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রামস্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা যে তোমাকে অনুসন্ধান করে—যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে। কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রুসকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়াছে। হা! কতদিন, আর কতদিন আমি সেই দিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিব, যে দিন তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল কামনা সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে যে, হে জগদীশ্বর, তোমার সমান আর কে আছে। এই সময়ে আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন তোমাকে দেখিতেছি, যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য"।

এই স্তোত্রটি ফরাশিশ ব্রহ্মবাদী ফেনেলন মহাত্মার রচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু ইহা সুনিপুণরূপে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মধ্যে আমি উপযোগী উপনিষৎ-বাক্য সকল প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। এই স্তোত্র পাঠের পর দেখিলাম যে, অনেক ব্রাহ্ম ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে এপ্রকার ভাব কখনই দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা হইল

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, এখনো আমাদের বাড়ীতে পূজা হয়—দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা। সকলের মনে কষ্ট দিয়া, সকলের মতের বিরুদ্ধে আমাদের ভদ্রাসন বাড়ী হইতে চিরপ্রচলিত পূজা ও উৎসব উঠাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। আমি আপনিই ইহাতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র থাকি, তাহাই ভাল। আমাদের পরিবারের মধ্যে কাহারো যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, কাহারো ভক্তি থাকে, তাহাতে আঘাত দেওয়া অকর্ত্তব্য। আমার ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া ধীরে ধীরে পূজা উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ তখন য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার উদার মন ও প্রশস্ত ভাব দেখিয়া আমার আশা হইয়াছিল যে, তিনি প্রতিমা পূজার বিরোধী হইয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। কিন্তু আমাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। তিনি বলিলেন যে, দুর্গোৎসব আমাদের সমাজ-বন্ধন, বন্ধু-মিলন ও সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না—করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে। তথাপি আমার উপদেশ ও অনুরোধে বাধিত হইয়া জগদ্ধাত্রী পূজাটা উঠাইয়া দিতে আমার ভ্রাতারা সম্মত হইলেন। সেই অবধি জগদ্ধাত্রী পূজা আমাদের বাড়ী হইতে চিরদিনের জন্য রহিত হইল। দুর্গা-পূজা চলিতেই লাগিল। আমি সেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণের সময় হইতে দুর্গোৎসবে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে যে আরম্ভ করিয়াছিলাম এখনো তাহার শেষ হইল না। এখনো আশ্বিন মাস আইলেই আমি কোথাও না কোথাও চলিয়া যাই। এ বৎসরে

১৭৭১ শকে পূজা এড়াইবার জন্য আসাম অঞ্চলে বহির্গত হই-লাম। বাষ্পতরীতে ঢাকায় গেলাম, সেখান হইতে মেঘনা পার হইয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া গৌহাটীতে পঁহুছিলাম। গৌহাটীতে বাষ্পতরী লাগান হইলে সেখানকার কমিসনার সাহেব ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাহা দেখিতে আইলেন ও আমার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সকলেই আগ্রহ সহকারে আমার সহিত আলাপ করিলেন। আমি কামাখ্যার মন্দির দেখিতে যাইব শুনিয়া সকলেই আপন আপন হস্তী পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া গেলেন। আমার সেই কামাখ্যার মন্দির দেখিতে যাইবার যে ব্যগ্রতা, তাহাতে আমি ভোরে ৪টার সময় উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু তীরে কাহারো হস্তী দেখিতে পাইলাম না, কেবল কমিসনার সাহেবের হস্তীই আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছে, কেবল তিনিই আপনার কথা রক্ষা করিয়াছেন। আমি তাহা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া তীরে নামি-লাম এবং পদব্রজেই চলিলাম এবং মাহুতকে পশ্চাতে হস্তী আনিতে আদেশ করিলাম। খানিক যাইয়া দেখি যে, হস্তী পিছে পড়িয়া রহিয়াছে। মাহুত হস্তীকে লইয়া একটা ছোট নালা উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহা দেখিয়া ক্ষণেক হস্তীর জন্য অপেক্ষা করিলাম, বিলম্ব হইতে লাগিল, সে মাহুত হাতীকে নালা পার করাইতে পারিতেছে না। আমার ধৈর্য্য চলিয়া গেল, আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। পদব্রজেই তিন ক্রোশ চলিয়া কামাখ্যার পর্ব্বতের পাদদেশে পঁহুছিলাম এবং বিশ্রাম না লইয়াই তাহাতে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের পথ প্রস্তরে নির্ম্মিত। পথের দুই দিকে ঘোর জঙ্গল, সে জঙ্গলের ভিতরে দৃষ্টি চলে না। সে পথ সোজা হইয়া উঠিয়াছে। সেই নির্জ্জন বন-পথে একা উঠিতে লাগি-লাম, তখনও সূর্য্য উদয় হইতে অল্প বিলম্ব আছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, আমি তাহা না মানিয়া ক্রমিক উঠিতেছি। পথের

তৃতীয় ভাগ উঠিয়াছি, পা তখন অবশ হইল, আর আমার ইচ্ছামত পা চলে না। আমি পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া একটা উচ্চ পাথরের উপরে বসিলাম। আমি একেলা সেই জঙ্গলে বসিয়া ভিতরে পরিশ্রমের ঘর্ম্ম এবং বাহিরে বৃষ্টিতে ভিজিতেছি। ভয় হইতেছে যে, সেই জঙ্গল হইতে বাঘ ভালুক বা আর কি আসে; এমন সময় দেখি যে, সেই মাহুৎটা আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, "আমি তো হাতী আনিতে পারিলাম না, আপনি একেলা যাইতেছেন দেখিয়া আমি আপনার পিছে পিছে ছুটিয়া আসিয়াছি"। তখন আমার শরীরে একটু বল আসিয়াছে, আমার অঙ্গ স্ববশ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার আমি পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উপরে একটি বিস্তীর্ণ সমভূমি, অনেকগুলা চালা ঘর তাহার উপরে রহিয়াছে। কিন্তু কোথাও একটি লোকও দেখিলাম না। আমি কামাখ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, সে তো মন্দীর নয়, একটি পর্ব্বত গহ্বর,—তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই, একটি কেবল যোনিমুদ্রা আছে। আমি ইহা দেখিয়া এবং পথপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। তাহার স্নিগ্ধ জলের গুণে আমার শরীরে আবার নূতন বল আইল। তাহার পর দেখি যে ৪০০।৫০০ লোক ভিড় করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছে। আমি বলিলাম, তোমরা কি চাও? তাহারা বলিল "আমরা কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডা, আপনি কামাখ্যা দেখিয়া আসিয়াছেন, আমরা কিছুই পাই নাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হয়, এইজন্য আমরা বেলা না হইলে নিদ্রা হইতে উঠিতে পারি না। আমি বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও, আমার নিকট হইতে কিছুই পাইবে না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার পর বৎসরের আশ্বিন মাসে শরতের শোভা প্রকাশ হইল, আমার মনে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইল। এবার কোথায় বেড়াইতে যাই, তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। জলের পথেই বেড়াইতে বাহির হইব, এই মনে করিয়া গঙ্গাতীরে নৌকা দেখিতে গেলাম। দেখি যে, একটা বড় ষ্টীমারে খালাশীরা তাহার কাজকর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছে। মনে হইল এই ষ্টীমারটা শীঘ্রই বাহিরে যাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ষ্টীমার এলাহাবাদ কবে যাইবে? তাহারা বলিল যে, এই ষ্টীমার দুই তিন দিনের মধ্যে সমুদ্রে যাইবে। জাহাজ সমুদ্রে যাইবে শুনিয়া আমার সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার বড়ই সুবিধা মনে করিলাম। আমি অমনি কাপ্তেনের কাছে যাইয়া তাহার একটা ঘর ভাড়া করিলাম। এবং যথা সময়ে তাহাতে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হইলাম। সমুদ্রের নীল জল ইহার পূর্ব্বে আর আমি কখনো দেখি নাই। তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জ্বল সমুদ্রে দিনরাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন হইলাম। সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে এক রাত্রির পর বেলা ৩টার সময় একটা স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিল। সম্মুখে দেখি, একটা শ্বেত বালুর চড়া, তাহার উপরে একটা বসতির মত বোধ হইল। আমি একটা নৌকা করিয়া তাহা দেখিতে গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি যে, কতকগুলা মাদুলী গলায় চট্টোগ্রামবাসী বাঙ্গালীরা আমার নিকটে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যে এখানে? তোমরা এখানে কি কর? তাহারা বলিল, "আমরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করি। আমরা এখানে

এই আশ্বিন মাসে মার এক খানি প্রতিমা আনিয়াছি।” আমি এই ব্রহ্মরাজ্যের খাএকফূ নগরে দুর্গোৎসবের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আবার এখানেও সেই দুর্গোৎসব! সেখান হইতে জাহাজে ফিরিয়া আইলাম এবং মুলমীনের অভিমুখে চলিলাম। যখন জাহাজ সমুদ্র ছাড়িয়া মুলমীনের নদীতে গেল, তখন গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া গঙ্গা নদীতে প্রবেশের ন্যায় আমার বোধ হইল। কিন্তু এ নদীর তেমন কিছুই শোভা নাই। জল পঙ্কিল, কুম্ভীরে পূর্ণ। সে নদীতে কেহ অবগাহন করে না। মুলমীনে আসিয়া জাহাজ নোঙ্গর করিল। এখানে মান্দ্রাজবাসী এক জন মুদেলিয়র আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপনি আসিয়া আমাকে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি এক জন গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী, অতি ভদ্র লোক। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। যে কয়দিন আমি মুলমীনে ছিলাম, সেই কয় দিনের জন্য আমি তাঁহারই আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আমি অতি সন্তোষে তাঁহার বাড়ীতে এ কয়দিন কাটাইলাম। মুলমীন নগরের পথ সকল পরিষ্কার ও প্রশস্ত। দু-ধারী দোকানে কেবল স্ত্রীলোকেরাই নানাপ্রকার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে। আমি পেটরা ও উৎকৃষ্ট রেশমের বস্ত্রাদি তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিলাম; বাজার দেখিতে দেখিতে একটা মাছের বাজারে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, বড় বড় টেবিলের উপরে বড় বড় মাছ সব বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সব অতি বড় বড় কি মাছ? তাহারা বলিল, “কুমীর”। বর্ম্মারা কুমীর খায়। অহিংসা-বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ইহাদের মুখে, কিন্তু পেটে কুমীর। এই মুলমীনের প্রশস্ত রাস্তা দিয়া এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতেছি—দেখি, এক জন লোক আমার দিকে আসিতেছে। একটু নিকটে আইলে বুঝিলাম, সে বাঙ্গালী। সেখানে তখন বাঙ্গালী দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম—

এই সমুদ্রপারে বাঙ্গালী কোথা হইতে আইল? বাঙ্গালীর অগম্য স্থান নাই। আমি বলিলাম, কোথা হইতে তুমি এখানে? সে বলিল, "আমি একটা বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি"। আমি অমনি সে বিপদ বুঝিতে পারিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বৎসরের বিপদ? সে বলিল, "সাত বৎসরের"। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়াছিলে? সে বলিল, "আর কিছু নয়, একটা কোম্পানীর কাগজ জাল করিয়াছিলাম। এখন আমার মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে বাড়ী যাইতে পারিতেছি না"। আমি তাহাকে পাথেয় দিতে চাহিলাম। কিন্তু সে কোথায় বাড়ী আসিবে! সে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। সে কি আর কালা মুখ দেখাইতে দেশে আসিবে!

মুদেলিয়ার আমাকে বলিলেন যে, এখানে একটি দর্শনীয় পর্ব্বত-গুহা আছে, অভিপ্রায় হইলে আপনাকে সঙ্গে লইয়া তাহা দেখাইতে পারি। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। তিনি সেই অমাবস্যার রাত্রির জোয়ারে একটা লম্বা ডিঙি আনিলেন, তাহার মাঝখানে একটা কাঠের কামরা। সেই রাত্রিতে মুদেলিয়ার এবং আমি জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতি ৭।৮ জনকে লইয়া তাহাতে বসিলাম এবং রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নৌকা ছাড়িলাম। আমরা সারারাত্রি সেই নৌকাতে বসিয়া জাগিয়া রহিলাম। সাহেবেরা তাঁহাদের ইংরাজী গান গাহিতে লাগিলেন। আমাকেও বাঙ্গালা গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে লাগিলাম। তাহারা কেহই তাহার কিছুই বুঝিল না, তাহারা হাসিতে লাগিল, তাহাদের তাহা ভালই লাগিল না। সেই রাত্রিতে ১২ ক্রোশ চলিয়া আমরা আমাদের গম্যস্থানে ভোর ৪টার সময়ে পঁহুছিলাম। আমাদের নৌকা তীরে লাগিল। এখনো সব অন্ধ-

কার। তীরের অদূরে দেখি যে, একটা তরু ও লতা বেষ্টিত বাড়ী হইতে কতকগুলা দীপের আলো বাহির হইতেছে। আমি কৌতূহল বিশিষ্ট হইয়া সেই অজ্ঞাত স্থানে, সেই অন্ধকারে অন্ধকারে একা দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি একটি ক্ষুদ্র কুটীর, তাহার মধ্যে গেরুয়া বসন পরা মুণ্ডিতমস্তক কতকগুলি সন্ন্যাসী মোম বাতীর আলো লইয়া তাহা একবার এখানে একবার ওখানে রাখিতেছে। এখানেও কাশীর দণ্ডীর ন্যায় লোকদের দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এখানে দণ্ডীরা আইল কোথা হ'তে? তাহার পরে জানিলাম যে, ইহারা ফুঙ্গী, বৌদ্ধদিগের গুরু ও পুরোহিত। আমি আড়ালে থাকিয়া ইহাদের এই বাতির খেলা দেখিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এক জন আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের ঘরের ভিতর আমাকে লইয়া গেল। বসিতে আসন দিল এবং পা ধুইবার জল দিল। আমি তাহাদের ঘরে গিয়াছি, তাহারা এইরূপে আমার অতিথি সৎকার করিল। বৌদ্ধদিগের অতিথি সেবা পরম ধর্ম্ম। প্রাতঃকাল হইল, আমি নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। সূর্য্য উদয় হইল। মুদেলিয়রের আর আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসিয়া সেখানে যোগ দিলেন। ইহাতে আমরা পঞ্চাশ জন হইলাম। মুদেলিয়ার সেখানে আমাদের সকলকে আহার করাইলেন। তিনি অনেকগুলি হস্তী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমরা দুই চারি জন করিয়া সেই হস্তীতে চড়িয়া সেখানকার মহাজঙ্গল দিয়া চলিলাম। এখানে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়, আর ঘন ঘন জঙ্গল। হাতী ভিন্ন এখানে চলিবার আর অন্য উপায় নাই। আমরা বেলা ৩টার সময়ে সেই পর্ব্বতের গুহার সম্মুখে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমরা হাতী হইতে নামিয়া এখান হইতে এক কোমর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। সেই পর্ব্বতগুহার মুখ ছোট, আমরা সকলে গুঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুই পা গুঁড়ি দিয়া

গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম তাহার ভিতরে ভারি পিছল। পা পিছ্‌লে যাইতে লাগিল। সেখান হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া খানিক দূর গেলাম। ঘোর অন্ধকার, দিন ৩টার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন রাত্রি ৩টা। ভয় হইতে লাগিল যে, যদি সুড়ঙ্গের পথ হারাইয়া ফেলি তবে আমরা বাহির হইব কি প্রকারে? সমস্ত দিন এই গুহার মধ্যে ঘুরিতে হইবে। এই ভাবিয়া আমি যেখানেই যাই, সেই সুড়ঙ্গের ক্ষুদ্র আলোকটুকুর দিকে লক্ষ্য রাখিলাম। সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে আমরা পঞ্চাশ জন ছড়াইয়া পড়িলাম এবং দূরে দূরে দাঁড়াইলাম। আমাদের প্রতি জনের হাতে গন্ধক-চূর্ণ। যেখানে যিনি দাঁড়াইলেন তিনি সেখানকার পর্ব্বতে খুবরীর মধ্যে সেই গন্ধক-চূর্ণ রাখিয়া দিলেন। আমাদের দাঁড়ান ঠিক হইলে কাপ্তান আপনার গন্ধকের গুঁড়া জ্বালাইয়া দিলেন। অমনি আমরা সকলেই দীয়াসলাই দিয়া আপন আপন গন্ধক-চূর্ণ জ্বালাইয়া দিলাম। একেবারে সেই গুহার পঞ্চাশ স্থানে পঞ্চাশটা রংমশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল, আমরা গুহার ভিতরটা সব দেখিতে পাইলাম। কি প্রকাণ্ড গুহা! উপরের দিকে তাকাইলাম, আমাদের দৃষ্টি তাহার উচ্চতার সীমা পাইল না। গুহার ভিতরে বৃষ্টির ধারার বেগে স্বাভাবিক বিচিত্র কারুকর্ম্ম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। পরে আমরা বাহিরে আসিয়া সেই পর্ব্বতের বনে বন-ভোজন করিলাম এবং মুলমীনে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিতে আসিতে পথে নানা যন্ত্র-মিশ্রিত একতানের একটা বাদ্য শুনিতে পাইলাম। আমরা সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া নিকটে গেলাম। দেখিলাম যে, কতকগুলা বর্ম্মা সেখানে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছে। সেই আমোদে কাপ্তান সাহেবেরাও যোগ দিয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বড় আমোদ পাইলেন। একটি বর্ম্মার স্ত্রী ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, সে সাহেবদের এই বিদ্রূপ দেখিয়া

আমোদোন্মত্ত পুরুষদের কাণে কাণে কি বলিয়া গেল, অমনি তাহারা নৃত্য ও বাদ্য ভঙ্গ করিয়া কে কোথায় পলাইল। কাপ্তান সাহেবরা তাহাদের কত অনুনয় বিনয় করিয়া আবার নৃত্য করিতে বলিলেন। তাহারা শুনিল না, কে কোথায় চলিয়া গেল। ব্রহ্মরাজ্যে পুরুষদিগের উপরে স্ত্রীদিগের এত অধিকার। মুলমীনে ফিরিয়া আসিলাম। একটি উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম, তিনি বিনয়ের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। ফরাসের উপরে তিনি চৌকিতে আর আমি এক চৌকিতে বসিলাম। সে একটা প্রশস্ত ঘর! তাহার চারি কোণে তাঁহার চারিটি যুবতী কন্যা বসিয়া কি শিলাই করিতেছে। আমি বসিলে তিনি বলিলেন, "আদা!" অমনি তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ে আসিয়া আমার হাতে একটি গোলাকৃতি পানের ডিবা দিল। আমি খুলে দেখি যে, তাহাতে পানের মসলা। বৌদ্ধ গৃহীদিগের এই অতিথি সৎকার। তিনি তাঁহাদের দেশের উৎকৃষ্ট অশোক জাতীয় কতকগুলা ফুলের চারা আমাকে উপহার দিলেন। আমি তাহা বাড়ী আনিয়া বাগানে রোপণ করিয়াছিলাম কিন্তু এদেশে অনেক যত্নেও তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। এই গাছের যে ফল হয় বর্ম্মাদিগের তাহা অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য! যদি ১৬ টাকা কাছে থাকে তবে তাহা দিয়াও সেই ফল খরিদ করিবে। তাহাদের এই উপাদেয় খাদ্য কিন্তু আমাদের ঘ্রাণেরও অসহ্য।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মরাজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই শকের ফাল্গুন মাসের শেষে আমি কটকে যাই। যে পথে তীর্থযাত্রীরা জগন্নাথে যায়, আমি সেই পথে পাল্কীর ডাকে গিয়া কটকে পঁহুছিলাম। সেখানে এক খানি খোলার ঘরে বাসা করি। চৈত্র মাসে কটকে প্রচণ্ড রৌদ্র, তাহার উত্তাপে আমার শরীর বিকল হইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে পাণ্ডুয়া নামক স্থানে আমার জমিদারী কাছারীতে গেলাম এবং জমিদারী পরিদর্শন করিবার জন্য সেখানে কিছু দিন থাকিলাম। এখান হইতে জগন্নাথ দর্শনার্থ পুরীতে যাই, আমি রাত্রিতেই পাল্কীর ডাকে চলিলাম। প্রভাত হইল, তখন পুরীর অনতি দূরে একটি সুন্দর পুষ্করিণীর ধারে পঁহুছিলাম। শুনিলাম, ইহার নাম চন্দন-যাত্রার পুষ্করিণী। আমি সেখানে পাল্কী হইতে নামিলাম এবং সেই পুষ্করিণীর স্নিগ্ধ জলে স্নান করিয়া পথের ক্লেশ দূর করিলাম। স্নান করিয়া উঠিয়াছি, জগন্নাথের এক জন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি অমনি তাহার সঙ্গে সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলাম। আমার পায়ে জুতা ছিল না, তাহাতে পাণ্ডা বড় সন্তুষ্ট হইল। গিয়া দেখি যে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ, আর তাহার সেই দ্বারে লোকারণ্য। সকলেই জনন্নাথ দেখিতে উৎসুক। পাণ্ডার হাতে মন্দিরের চাবি ছিল, সে চাবি খুলিতে লাগিল। একটা দ্বার খুলিল, মন্দিরের মধ্যে একটা দীর্ঘ দালান দেখিতে পাইলাম, তাহার ভিতর গিয়া পাণ্ডা আর একটা দ্বার খুলিল, আবার আর একটা দালান দেখিলাম। যখন পাণ্ডা শেষ দ্বার খুলিল, তখন আমার পশ্চাতে হাজার যাত্রী ছিল, "জয় জগন্নাথ" বলিয়া তাহারা বেগে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অসাবধানে ছিলাম,

তখন তাহাদের সেই লোক-তরঙ্গের মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে কোন প্রকারে ধরিয়া সামলাইয়া রাখিল, কিন্তু আমার চশমাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সাকার জগন্নাথকে দেখিবার আর সুবিধা হইল না, আমি সেই নিরাকার জগন্নাথকেই দেখিলাম। এখানে যে একটি প্রবাদ আছে, যে যাহা মনে করিয়া এই জগন্নাথ মন্দিরে যায়, সে তাহা দেখিতে পায়। আমার নিকটে তাহা পূর্ণ হইল। এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার নির্ব্বাত মন্দিরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ যাত্রীদের অসম্ভব ভিড়। স্ত্রীলোকদিগের এখানে ভদ্রতা রক্ষা করা দায়। আমি সেই ভিড়ের তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে, নীত হইতে লাগিলাম, এক স্থানে নিমেষ মাত্রও দাঁড়াইয়া থাকা অসাধ্য বোধ হইল। তখন আমার সঙ্গের জমাদার ও পাণ্ডা আমার তিন দিকে একের হাত আর এক জন ধরিয়া রেল করিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে স্বয়ং জগন্নাথের রত্ন-বেদী আমার রক্ষক হইল। আমি তখন নিরাপদ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জগন্নাথের সম্মুখে বৃহৎ একটা তাম্র-কুণ্ড পূর্ণ জল, তাহাতে জগন্নাথের ছায়া পড়িয়াছে। সেই ছায়াকে দাঁতন করাইল, আবার তাহাতেই জল ঢালিয়া দিল; ইহাতেই জগন্নাথের দন্তধাবন ও স্নান হইয়া গেল। পাণ্ডারা তাহার পরে সেই জগন্নাথের উপরে চড়িয়া তাহাকে নূতন বসন ও নূতন আভরণ পরাইল। ইহাতেই ১১ টা বাজিয়া গেল। তাহার পরে ভোগের সময় হইল, আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আমি সেখান হইতে বিমলা দেবীর মন্দিরে গেলাম। এখানে লোক অতি অল্প। আমি যে বিমলা দেবীকে প্রণাম করিলাম না, তাহা সকলে দেখিতে পাইল। উড়িয়ারা তাহা দেখিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল— "কে—এ—প্রণাম করিল না? এ—কে?" সকলেই আমার প্রতি আক্রমণ করিল। ভাল গতিক না দেখিয়া আমার পাণ্ডা আমার

নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আমাকে আনিল। এখানে পাণ্ডা আমাকে বলিল—"বিমলা দেবীকে প্রণাম না করা ভাল হয় নাই। ইহাতে যাত্রীরা বঁড় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। একটা প্রণাম বৈতো নয়, তাহা করিলেই হইত।" আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বিমলা দেবীকে প্রণাম করিব কি, আমি মায়া দেবীকেই প্রণাম করি নাই। তুমি জান, আমি মায়া পুরীতে গিয়াছিলাম। মায়ার মন্দিরে গিয়া আমি মায়াকে দেখিয়াছিলাম,—তিনি "তন্বীশ্যামা শিখর দশনা" তিনি মণি-মণ্ডিত পর্য্যঙ্ককে আলো করিয়া অর্দ্ধশয়ানা হইয়া রহিয়াছেন। আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও নাই। একজন সহচরী আমাকে ইঙ্গিত করিল "প্রণাম কর"। আমি বলিলাম, আমি কোন সৃষ্ট দেব দেবীকে প্রণাম করি না। তাহাতে তাহারা জিব্ কাটিয়া উঠিল। মায়াদেবী তাহাদের বলিল, "যদি এ প্রণাম না করে তবে একটা ফুল দিয়া যাউক"। আমি তাহাতে কোন কথা না কহিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। আমি নীচের তলায় নামিয়া বাহিরে যাইবার জন্য সম্মুখের বারাণ্ডায় গেলাম। সেই বারাণ্ডা হইতে পা বাড়াইয়াছি, দেখি যে, সম্মুখে আর একটা বারাণ্ডা। সে বারাণ্ডা ছাড়াইলাম, অমনি সম্মুখে আর এক বারাণ্ডা। এইরূপে যতই বারাণ্ডা ছাড়াই, ততই সম্মুখে বারাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়। কত কত বারাণ্ডা অতিক্রম করিলাম, কিন্তু ইহার আর অন্ত করিতে পারিলাম না। বুঝিলাম যে, আমি মায়া-জালে বন্দী হইয়া পড়িয়াছি। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। স্বপ্ন-রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। চেতন হইয়া দেখি যে, সেই মায়া দেবীর পুরীই এই জগন্নাথের পুরী। পাণ্ডা আমার এই কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, চলিয়া গেল। তাহার পরে মহাপ্রসাদের গোল। মহাপ্রসাদ লইয়া ভারি আনন্দ পড়িয়া গেল। জমাদার, ব্রাহ্মণ, চাকর, সকলেই

সেই মহা-প্রসাদ লইয়া এ উহার মুখে ও ইহার মুখে দিতে লাগিল। তখন আর ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ রহিল না। সকলেই একত্রে খাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। উড়েরা ধন্য, তাহারা এবিষয়ে সকলকে জিতিয়াছে; তাহারা সকল জাতিকে এক করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি এই পুরী হইতে পুনর্ব্বার কটকে ফিরিয়া আইলাম। সেখানে আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে, আমাদের জমিদারীর দেওয়ান রাম চন্দ্র গাঙ্গুলির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি রাম মোহন রায়ের এক জন আত্মীয় কুটুম্ব এবং তাঁহার পুত্র রাধা প্রসাদ রায়ের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমার পিতা তাঁহাকে আমাদের সমস্ত জমিদারীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি অদ্যাপি আমাদের অধীনে থাকিয়া অতি নিপুণরূপে জমিদারীর কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি ব্যস্ত হইয়া কটক হইতে ১৭৭৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ীতে ফিরিয়া আইলাম এবং জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

১৭৭৬ শকে গিরীন্দ্র নাথের মৃত্যু হয়। তিনি হাউসের কার্য্য যে প্রকার নিপুণতার সহিত চালাইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে সে কার্য্য চালাইবার একটা বড়ই অভাব পড়িয়া গেল। এত দিনে অনেক ঋণ পরিশোধও হইয়াছে, অনেক অবশিষ্টও আছে। কোন কোন পাওনাদারেরা টাকা পাইবার বিলম্ব আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের নামে নালিশও করিয়াছে এবং ডিক্রীও পাইয়াছে। আমি এই সময়ে প্রতিদিন মধ্যাহ্নের ভোজনের পর তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের দোতালায় সভার কার্য্যালয়েই থাকিতাম। এক দিন আমি আহারের পর সভায় যাইতেছি, এমন সময় আমার বাড়ীর লোকেরা বলিল যে, "আজ সভায় যাবেন না, আজ একটা ওয়ারিণের আশঙ্কা আছে।" মিথ্যা একটা বাধা মাত্র মনে করিয়া আমি ইহা শুনিয়াও সভাতে চলিয়া গেলাম এবং সেখানে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে দেখি যে, এক জন বাঙ্গালী কেরাণী আসিয়া চোক মুখ লাল করিয়া আমাকে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল—"আমি যে আজ আপনাকে এখানে আসিতে মানা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম; আপনি আজ এখানে কেন এলেন?" পরে সে পশ্চাদ্বর্ত্তী বেলিফকে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ইনিই দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।" তখন সেই বেলিফ আমাকে এক খানা ওয়ারেণ্ট দিল। বলিল "১৪০০০ চৌদ্দ হাজার টাকা এখনি দাও"। আমি বলিলাম, চৌদ্দ হাজার টাকা এখন আমার কাছে নাই। সে বলিল, "তবে এখনি আমার সঙ্গে সেরিফের নিকট এস"। আমি তাহাকে একটু বসিতে বলিয়া গাড়ি আনিতে পাঠাইলাম।

গাড়ি আসিল এবং সেই সাহেব বেলিফ সেই গাড়িতে করিয়া আমাকে সেরিফের নিকটে লইয়া গেল। এদিকে আমাদের বাড়ীতে মহা গোল উঠিয়াছে—আমাকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সকলেই আমাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে বারণ করিয়াছিল, আমি কাহারো কথা শুনি নাই, আমাকে ওয়ারেণ্ট ধরিয়াছে; সকলেরি মুখে এই কথা। আমাদের উকিল জজ সাহেবই ঘটনাক্রমে সেই বৎসরে সেরিফ ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার আফিসে বসাইলেন এবং আমি যে কেন আজ বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ জজ কলবিনের নিকট গিয়া উপস্থিত। তিনি জামিন দিয়া আমাকে খালাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন আমাদের বাড়ীর চন্দ্র বাবু প্রভৃতি জামিন হইয়া আমাকে কারাবাসের দায় হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন। আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ইহা অবগত হইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না, কিছুই বলে না, আমাকে জানাইলেই তো আমি তার ঋণের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি"। আমি ইহা শুনিয়া তাহার পর দিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "দেখ, তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিত মত তোমার দেনা পরিশোধ করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না"। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনফাই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম এবং তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। সেই অবধি শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কাছে আমি প্রায়ই প্রতিদিন প্রাতে যাইতাম। তাঁহাকে হিসাব পত্র দেখাইতাম এবং দেনা

পাওনার কথা বার্ত্তা কহিয়া আসিতাম। সেই সময়ে যখনি আমি যাইতাম, দেখিতাম তাঁহার এক প্রান্তে শাদা একটি মোড়াশা পাগড়ি পরিয়া তাঁহার প্রিয় মোসাহেব নব বাঁড়ুয্যা নিয়তই রহিয়াছে। যেমন জজের কোর্টে শেরিফ, সেইরূপ ইহাঁর দরবারে নব বাঁড়ুয্যা। নব বাঁড়ুয্যার সহিত তাঁহার সকল বিষয়েরই পরামর্শ হইত। নব বাঁড়ুয্যা কেবল তাঁহার একমাত্র বিশ্বাস-পাত্র ছিল। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সাক্ষাতে এই নব বাঁড়ুয্যা এক দিন আমাকে বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বড় ভাল কাগজ। আমি বাবুর লাইব্রেরীতে বসিয়া ইহা পড়ি; ইহা পড়িলে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়"। আমি বলিলাম, তুমি কি তত্ত্ববোধিনী পড়? প'ড়ো না, প'ড়ো না। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বলিলেন, কেন? তত্ত্ববোধিনী পড়িলে কি হয়? আমি বলিলাম, তত্ত্ববোধিনী পড়িলে আমার যে দশা, তাই হয়। তিনি বলিলেন, "আরে, দেবেন্দ্র কোব্‌লো জবাব দিলো—একেবারে যে কোবলো জবাব দিলো"। এই বলিয়া তিনি বড়ই হাসিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন—"আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি?" আমি বলিলাম, ঐ দেওয়ালটা যে ওখানে আছে আপনি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি? তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আরে, দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি?" আমি বলিলাম, ঈশ্বর যে এই সর্ব্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি? তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর আর দেওয়াল বুঝি সমান হইল? হাঃ, দেবেন্দ্র বলে কি?" আমি বলিলাম যে, এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু—তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে মানেন না, শাস্ত্রে তাঁহাদের নিন্দা আছে। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং"। অসুরেরা অসত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা জগতে ঈশ্বর নাই বলিয়া

থাকে। তিনি বলিলেন, "শাস্ত্রের কিন্তু আমি এই কথাটি সকল হইতে মান্য করি।" অহং দেবো নচান্যোস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্। আমি নিত্য মুক্ত স্বভাববান্ পরমেশ্বর; আমি অন্য কেহ নই"। তিনি যদি এ প্রকার অভিমান করিতেন যে, "আঢ্যোহং জনবানস্মি কোন্যোস্তি সদৃশো ময়া"। আমি ধনাঢ্য, আমি বহুলোকের প্রভু; আমার সমান আর কে আছে। তবে তাঁহার এ অভিমানও বরং শোভা পাইত, কিন্তু আমি স্বয়ং পরমেশ্বর, এমন অভিমান বড়ই অনর্থের বিষয়, ইহাতে জিব্ কাটিতে হয়। বিষয়ের শত পাশে বদ্ধ হইয়া—জরা শোকে, পাপে তাপে মগ্ন হইয়া আপনাকে নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ মনে করা চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য জীব ব্রহ্মে ঐক্য মত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ মতে সন্ন্যাসীরা এবং গৃহস্থেরাও এই প্রলাপ-বাক্য বলিতেছে যে, "সোঽহং"। "আমি সেই পরমেশ্বর"।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১৭৭৮ শকের ২৯শে পৌষ ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভা হয়। এই সভাতে শ্রীযুক্ত রমা নাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দুই জন ট্রষ্টীর পদ শূন্য ছিল। এই সভার উদ্দেশ্য সেই দুই শূন্য পদে দুই জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করা। ট্রষ্টডীডের নিয়মানুসারে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কেবল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুরেরই ছিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারে অদ্যকার সভায় সভাপতি মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিতে আমাকে এবং রমা প্রসাদ রায়কে ব্রাহ্মসমাজের দুই জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিলেন।

আমি ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে বীজ লিখিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, এক বৎসর পরে তাহা আমি বাক্স হইতে বাহির করি। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, এই বীজ সারগর্ভ। ইহার দ্বিতীয় মন্ত্রে "আনন্দং" ও "বিচিত্র শক্তিমৎ" শব্দের পরিবর্ত্তে "অনন্তং" ও "সর্ব্বশক্তিমৎ" শব্দ বসাইয়া দিলাম এবং তৃতীয় মন্ত্রে "সুখং" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "শুভং" শব্দ বসাইয়া দিলাম। দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষে "ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমং" শব্দ যোগ করিয়া দিলাম। ১৭৭৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে এই বীজের চতুর্থ মন্ত্র প্রকাশিত হয়—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ১৭৭৯ শকের বৈশাখ মাস হইতে সম্পূর্ণ বীজ মন্ত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে প্রকাশিত হইতে লাগিল—"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নির-বয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ

সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরুপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"। এই বীজ প্রকাশ হওয়ার পর দেখি যে, সকল ব্রাহ্মেরই ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি, সকলেরই ইহাতে সন্তোষ। ইহাতে অদ্য পর্য্যন্ত কাহারো আপত্তি হয় নাই। যদিও ব্রাহ্মসমাজ বহুধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে এই বীজ মন্ত্র সকল ব্রাহ্মেরই একমাত্র ঐক্যস্থল হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে একজন নিষ্ঠাবান্ চিন্তাশীল ব্রাহ্ম বক্তৃতাতে এই বীজের প্রশংসায় বলিয়াছিলেন যে, "পৃথিবী মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে বিবেক রাজার অধিষ্ঠান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয় দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা মানব প্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই"।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এত দিনে, এই দশ বৎসরে আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃ-ঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্র নাথ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃ-ঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্র নাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়—এমন কি, ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর এক জনকে আনুকূল্য করিতেন—তিনি এমনি পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয় ব্যবহার লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল। এক দিন এক জন ঋণ-দাতা তাঁহাকে টাকার জন্য কিছু তীব্রোক্তি করিয়াছিল, ইহাতে তিনি আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ঋণ-দাতাকে আমি যে নোট লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে আপনি আমার সহিত স্বাক্ষর না করিলে সে আমাকে ছাড়িতেছে না।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার যাহা আছে তাহা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নোটে কি খতে আমি সহি করিয়া দিতে পারি না। আমি একে এই উপস্থিত ঋণই পরিশোধ করিতে পারিতেছি না, আমি কোথায় আবার তোমাদের এই নূতন ঋণে আবদ্ধ হইতে যাইব? জানিয়া শুনিয়া আমি আর এই ঋণের পাপানলে ঝাঁপ দিতে পারিব না। তিনি আমার এই কথা শুনিয়া একটা দেওয়ালে ঠেশ দিয়া তিন ঘণ্টা কাঁদিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আমি

তাঁহার নোটে সহি করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, "আমাদের গালিমপুরের রেশমের কুঠী ইজারা দিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে এবং আমাদের যত পুস্তক আছে তাহা বিক্রয় করিয়া যত টাকা হইবে সব তুমি লও, আমি দিতেছি, কিন্তু পরিশোধ করিবার উপায় না জানিয়া আমি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কর্জ্জা নোটে সহি দিতে পারিব না"। তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। দাদা আমাকে সাহায্য করিলেন না বলিয়া, অভিমান পূর্ব্বক তিনি আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন এবং আমার ছোট কাকা রমা নাথ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমি অতঃপর তাঁহাকে আট হাজার টাকার নোটে সহি দিলাম এবং তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, আমাদের যে সকল পুস্তক আছে, তাহা তিনি বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা শোধ দিবেন, ইহার জন্য আর আমাকে ভবিষ্যতে কোন যন্ত্রণা পাইতে হইবে না। নগেন্দ্র নাথ তথাপি আর বাড়ীতে আসিলেন না, ছোট কাকার বাড়ীতেই থাকিলেন। এই সকল ঘটনায় আমার মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেল। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিলে এইরূপ নানা উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং ক্রমে আবার ঋণ-জালেও বদ্ধ হইতে হইবে, অতএব আমিও বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না। ওদিকে অক্ষয় কুমার দত্ত একটা আত্মীয় সভা বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা—এক জন বলিলেন, "ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ কি না"? যাহার যাহার আনন্দ স্বরূপে বিশ্বাস আছে তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত। এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গস্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্ম্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না।

কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল। ইহাতে আমার এই একটি মহৎ উপকার হইল যে, এখন আমি আত্মার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। আত্মার মূলতত্ত্ব কি; ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-স্রোতে যে সকল সত্য ঈশ্বরের প্রসাদে আমার নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা জ্ঞানালোকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার নিগূঢ় অর্থ সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় যত্নবান্ হইলাম।

عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم
درد و دریغ که غافل ز کار خویشتنم

"প্রকাশ হ'লো না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আইলাম। দুঃখ ও পরিতাপ যে, আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া র'য়েছি"। কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না। অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না; আর আমি লোকেদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আমাকে উপদেশ দিতেছেন, "কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ। তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ।" কার তুমি এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, হে ভ্রাত, এই তত্ত্বটি চিন্তা কর। এই সময়ে ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে আমি বরাহ নগরে শ্রীযুক্ত গোপাল লাল ঠাকুরের বাগানে ছিলাম। এখানে শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়িতাম। পড়িতে পড়িতে তাহার এই শ্লোকটা আমার মনে লাগিয়া গেল—"আমযোযশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব

হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং”। হে সুব্রত! জীবদিগের যে রোগ যে দ্রব্য দ্বারা জন্মে, সে দ্রব্য কখনো রোগীকে আরাম করিতে পারে না। আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ ঘোরে পড়িয়াছি, অতএব এ সংসার আর আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব এখান হইতে পলাও। সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই সুখ দিত, বড়ই শান্তি দিত। মনে করিতাম, ইহারা কেমন কামচার। কেমন মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিলাম “যইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি”। যাহারা এখানে এখন আত্মাকে জানিয়া এবং এই সকল সত্য কামনাকে জানিয়া পরিব্রজন করে, তাহারা পরকালে সকল লোকেই কামচার হয়, সকল লোকেই ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করিতে পারে। এইটি আমার বড়ই লোভনীয় হইল। ভাবিলাম, আমি এখান হইতে গিয়া সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইব। আবার যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে দেখিলাম—“ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ”। না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে ভোগ করা যায়। তখন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলি আমার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন্ আশ্বিন মাস আসিবে—আমি এখান হইতে পলাইব, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।

ترا ز کنگرهٔ عرش میزنند صفیر
ندانمت که درین دامگهه چه افتاد است

"সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে, না জানি, এই থিবীর মোহ-পাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে"।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি যে আশ্বিন মাসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এক্ষণে উপস্থিত হইল। কাশী পর্য্যন্ত এক শত টাকায় একটি বোট ভাড়া করিলাম। ১৭৭৮ শকের ১৯শে আশ্বিন বেলা ১১ টার সময় গঙ্গায় জোয়ার আইল, আমার মনেও নব উৎসাহের উৎস ছুটিল। আমি গিয়া সেই নৌকাতে আরোহণ করিলাম। নোঙর উঠিল, বোট চলিল, আমি ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম—

کشتي نشستگانيم اي باد شرطه برخيز
باشد که باز بينيم ديدار آشنا را

"আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি, হে অনুকূল বায়ু! তুমি উঠ। হয়তো আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।" আশ্বিন মাসের গঙ্গার প্রতিকূল স্রোতে নবদ্বীপে পঁহুছিতে ছয় দিন লাগিল। গঙ্গার মধ্যে একটা চড়াতে রাত্রিতে থাকিলাম। চারি দিকে গঙ্গা, মধ্যে এই দ্বীপটি ভাসিতেছে। প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির জন্য দুই দিন এখান হইতে আর নড়িতে পারিলাম না। ১৬ই কার্ত্তিকে মুঙ্গেরে পঁহুছিলাম। ভোর ৪টার সময়ে এখান হইতে সিতাকুণ্ড দেখিতে চলিলাম। নৌকা হইতে তিন ক্রোশ হাঁটিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পঁহুছিলাম। সেই কুণ্ডের জল এত তপ্ত যে, তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। তাহার চারিদিকে রেল দেওয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাতে রেল দেওয়া কেন? সেখানকার লোকেরা বলিল, "যাত্রীরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে ইহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তাই হাকিমের হুকুমে রেল দেওয়া হইয়াছে"। আমি তাহা দেখিয়া আবার সেই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া ক্ষুধিত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত হইয়া বোটে ফিরিয়া আইলাম। "পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহহং

তৃট্ পরাতো বুভুক্ষিতঃ"। তাহার পরে ফতুয়ায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া চলিতেছি, এমন সময়ে প্রবল ঝড় উঠিল। তাড়াতাড়ি বোট ডাঙ্গার দিকে লইয়া গেল। ডাঙ্গায় তো আসিল, কিন্তু প্রতি-কূল ঝড় গঙ্গার উচ্চ পাড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল। নৌকা ভাঙ্গে, আর কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। আমি সেই দোলায়মান বোট হইতে উঠিয়া পাড়ের উপর দাঁড়াইলাম। সেখানে ভূমি যদিও আমার প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু ঝড়ে আমি অস্থির; চড়ার বালু যেন ছিটা গুলির মত আমার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া গঙ্গার সেই প্রমত্ত ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যে সেই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গের পান্সীখানা সকল আহারীয় সামগ্রী লইয়া গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়া গেল। পরে আমরা পাটনায় আসিয়া নূতন আহারের সামগ্রী লইলাম। সেখানে গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল, নৌকা আর চলিতে পারে না। সেই দুর্জ্জয় স্রোতের প্রতিকূলে পাটনা ছাড়াইয়া ৬ই অগ্রহায়ণে কাশীতে পঁহু-ছিলাম। কলিকাতা হইতে কাশী আসিতে প্রায় দেড় মাস লাগিল। প্রাতঃকালেই সেই বোট হইতে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া, কোথায় থাকি, কোথায় বাসা পাই, তাহা দেখিতে দেখিতে শিক্রোলের দিকে চলিলাম। খানিক দূর গিয়া দেখি, একটা বাগানের মধ্যে একটা ভাঙ্গা শূন্য বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে একটা কূপের ধারে কতকগুলা সন্ন্যাসী বসিয়া জল্পনা করিতেছে। আমি মনে করিলাম, এ বাড়ীটা বুঝি সাধারণের জন্য, এখানে যে সে থাকিতে পায়। এই মনে করিয়া আমার জিনিস পত্র লইয়া সেই বাড়ীতে উঠিলাম। তাহার পর দিন দেখি যে, কাশীর প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র মিত্রের পুত্র গুরু দাস মিত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভাবিলাম, আমার এখানে আসিবার কথা ইনি কেমন করিয়া জানিলেন?

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া আমার নিকটে বসাইলাম। তিনি বলিলেন যে, "আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, আপনি আমাদের এ বাড়ীতে উঠিয়াছেন। এ বাড়ীর দরজা নাই, পর্দ্দা নাই, আবরণ নাই, হিম পড়িতেছে। না জানি, রাত্রিতে আপনার কতই কষ্ট হইয়া থাকিবে। আপনার এখানে আগমন হবে তাহা পূর্ব্বে জানিলে সকলি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম"। তিনি অনেক শিষ্টাচার করিলেন এবং সেই স্থান আমার বাসোপযোগী করিয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিলেন। কাশীতে দশ দিন ছিলাম—বেস আরামে ছিলাম। আমি একটা ডাক গাড়ী করিয়া ১৭ই অগ্রহায়ণ কাশী ছাড়িলাম। সঙ্গে যে সকল চাকর ছিল তাহাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া দিলাম, কেবল দুই জন চাকরকে সেই গাড়ীর ছাদে বসাইয়া লইলাম। কিশোরী নাথ চাটুর্য্যে এবং কৃষ্ণনগরের এক জন গোয়ালা, এই দুই জনকে সঙ্গে লইলাম। তাহার পর দিন সন্ধ্যার সময়ে এলাহাবাদের পূর্ব্বপারে পঁহুছিয়া আমার গাড়ী একখানা পারের খেওয়ার নৌকাতে চড়াইয়া রাখিলাম। ভয়, পাছে ভোরে পারের নৌকা না পাই। আমি সেই নৌকার উপরে গাড়ীর মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রাটা ভোগ করিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে সেই পারের নৌকা শিথিল ভাবে চলিয়া বেলা দুই প্রহরের সময়ে ওপারে পঁহুছিল। দেখি যে, কেল্লার নীচে গঙ্গার চড়াতে অনেকগুলি ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে, এই সকল ধ্বজা যজমানদিগের পিতৃলোকে সমুন্নত হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডারা অর্থ সংগ্রহ করে। এই প্রয়াগ তীর্থ; এই প্রসিদ্ধ বেণী-ঘাট। এই ঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তর্পণ করে, দান করে। আমার নৌকা পঁহুছিতে পঁহুছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। এক জন পাণ্ডা "এখানে স্নান কর, মাথা মুণ্ডন কর," বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমি এ তীর্থে

যাইব না, মাথাও মুণ্ডন করিব না। আর এক জন বলিল, "তীর্থে যাও আর না যাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও"। আমি বলিলাম, আমি কিছুই দিব না; তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করিয়া খাও। সে বলিল, "হাম পয়সা লেকে তব্ ছোড়েঙ্গে—পয়সা দেনেই হোগা"। আমি বলিলাম, হাম পয়সা নহী দেগা, কিস্তরে লেগা, লেওতো? এই শুনিয়া সে নৌকা হইতে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল এবং দাঁড়িদের সঙ্গে গুণ ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। খানিক টানিয়া আমার কাছে নৌকায় দৌড়িয়া আসিল। বলিল, "হাম তো কাম কিয়া, অব্ পয়সা দেও"। আমি বলিলাম, এ ঠিক হইয়াছে, আমি হাসিয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। দুই প্রহর বাজিয়া গেল, তখন এইরূপ কষ্ট করিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নির্দ্দিষ্ট খেওয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম। তাহার পরে দুই ক্রোশ গিয়া একটা বাঙ্গালা পাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম। এলাহাবাদ ছাড়িয়া ২২শে অগ্রহায়ণে আগ্রাতে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার ডাকের গাড়ী দিন রাত্রি চলিত; মধ্যাহ্ন সময়ে পথের একটা গাছের তলায় রন্ধন করিয়া আহার করিতাম। আগ্রায় আসিয়া "তাজ" দেখিলাম। এ তাজ্ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। নীচে নীল যমুনা। মধ্যে শুভ্র, স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্র-মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে। আমি এই যমুনা দিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণে দিল্লী যাত্রা করিলাম। পৌষ মাসের শীতে কোন কোন দিন আমি যমুনাতে অবগাহন করিতাম, তাহাতে আমার শরীরের রক্ত জমাট হইয়া যাইত। বজ্‌রা চলিত কিন্তু আমি যমুনার ধারে ধারে শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, গ্রাম ও উদ্যানের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতাম।

তাহাতে আমার মনের বড়ই শান্তি হইত। ১১ দিনে এই যমুনা তীরে মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইলাম। মথুরাতে পঁহুছিয়াই মথুরা দেখিতে চলিলাম। যমুনার ধারে সন্ন্যাসীদিগের সত্র আছে। সেই সত্র হইতে এক জন সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিতেছে, "ইধার আইয়ে, কুছ্ শাস্ত্র চর্চ্চা করেঙ্গে"। আমার তখন মথুরাপুরী দেখিতে উৎসাহ, আমি তখন তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহার নিকটে গেলাম। সে তাহার দপ্তর খুলে কতকগুলি পুঁথি বাহির করিল। দেখিলাম যে, সকলি রাম মোহন রায়ের পুস্তকের হিন্দি অনুবাদ। সে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম-স্তোত্র "নমস্তে সতে" পড়িতে লাগিল। দেখিলাম যে, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের অনেকটা মিল। পথের মধ্যে এমন একটা লোক পাইয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তাহাকে আমার বজ্‌রাতে ডাকিয়া আনিলাম। সে বজ্‌রাতে আসিয়া আমার সঙ্গে আহারও করিল, কেবল একটু "কারণ" তাহাকে দিতে হইয়াছিল। সে সেই মদ খাইতে খাইতে পড়িতে লাগিল—"অলিনা বিন্দু মাত্রেণ ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ" "যে এক বিন্দু মদ্য পান করে, সে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার করে।" সে বলিল, "আমি শব সাধন করিয়াছি।" সে ঘোর তান্ত্রিক। রাত্রিতে সে আমার বজ্‌রাতে শুইয়া রহিল, ভোরে উঠিয়া কত কি পড়িতে লাগিল। সকালে যমুনাতে স্নান করিয়া তবে চলিয়া গেল। আমি তাহার পরে বৃন্দাবনে পঁহুছিলাম। সেখানে লালা বাবুর কীর্ত্তি গোবিন্দজীর মন্দির দেখিতে গেলাম। নাট মন্দিরে চারি পাঁচ জন বসিয়া সেতারের বাজনা শুনিতেছে। আমি গোবিন্দজীকে প্রণাম করিলাম না দেখিয়া তাহারা সচকিত হইল। আগ্রা হইতে এক মাসে দীল্লির চড়াতে আসিয়া ২৭শে পৌষে আমার বজ্‌রা লাগিল। দেখিলাম—উপরে বড়ই ভিড়। সেখানে দীল্লির বাদসাহ ঘুঁড়ি উড়াইতেছেন। এখন তো তাঁহার

হাতে কোন কাজ নাই, কি করেন ? দীল্লির সহরে গিয়া বাজারের উপর একটা বাড়ী ভাড়া করিলাম। আমাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নগেন্দ্র নাথ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি দীল্লি সহরের বড় রাস্তার ধারে বাজারের উপরে রহিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমি এ সংবাদ পরে জানিলাম। এখানে সুখানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য। এই হরিহরানন্দের সঙ্গে রাম মোহন রায়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাম মোহন রায়ের বাগানেই থাকিতেন। ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমি দীল্লিতে পঁহুছিবা মাত্রই সুখানন্দ স্বামী আমাকে আঙ্গুর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় হইল। সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে, "আমি এবং রাম মোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দতীর্থ স্বামীর শিষ্য; রাম মোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।" সকল ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকেরাই রাম মোহন রায়কে আপনার আপনার দিকে টানে। এখান হইতে প্রসিদ্ধ কুতব-মিনার ৮ ক্রোশ দূর। আমি তাহা দেখিতে গেলাম। ইহা হিন্দুর পূর্ব্ব কীর্ত্তি। মুসলমানেরা এখন ইহাকে কুতবুদ্দীন বাদশাহের জয়স্তম্ভ বলে, এই জন্য ইহার নাম কুতব-মিনার। হিন্দুদিগকে মুসলমানেরা যেমন পরাজয় করিল, তেমনি তাহাদের কীর্ত্তিও লোপ করিল। মিনার কি না, উন্নত স্তম্ভাকার প্রাসাদ। কুতব-মিনার প্রায় ১৬১ হাত উচ্চ। আমি সেই মিনারের সর্ব্বোচ্চ চূড়াতে উঠিয়া অর্দ্ধ নভোমণ্ডলের নিম্নে মহদায়তন ভূমির বিচিত্রতা দেখিয়া পুলকিত

হইলাম, এ সেই মহতোমহীয়ানেরই মহিমা। এখান হইতে ডাকের গাড়ী করিয়া আরো পশ্চিমে অম্বালায় পঁহুছিলাম। এখানে ডুলি করিলাম এবং কেবল কিশোরী নাথ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া লাহোরে গেলাম। লাহোর হইতে ফিরিয়া ৪ঠা ফাল্গুনে অমৃতসরে পঁহুছিলাম। তখন এখানে বিলক্ষণ শীত অনুভব করিলাম।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যদিও আমি অমৃতসরে পঁহুছিয়াছি, তথাপি আমার লক্ষ্য সেই অমৃতসর—সেই অমৃতসরোবর, যেখানে শিখেরা অলখ-নিরঞ্জনের উপাসনা করে। আমি অতি প্রত্যুষেই অমৃতসর সহর দিয়া সেই পুণ্যতীর্থ অমৃতসর দেখিতে ধাবিত হইলাম। অনেক পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, অমৃতসর কোথায়? সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এহি তো অমৃতসর"। আমি বলিলাম, নহী—বো অমৃতসর কাঁহা, যাঁহা পরমেশ্বরকা ভজন হোতা হ্যায়। বলিল, "গুরুদ্বারা? বো তো নজদিগই হ্যায়; ইসী রাস্তাসে যাও"। আমি সেই নির্দ্দিষ্টপথে গিয়া লাল বনাতের শাল রুমালের বাজারের বাহিরে দেখি যে, মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া তরুণ সূর্য্য কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া মন্দিরে গিয়া দেখি, কলিকাতার লালদিঘির ৪।৫ গুণ হইবে এমন একটা বৃহৎ পুষ্করিণী, তাহাই সরোবর। মাধবপুর হইতে জল-প্রণালী দিয়া ইরাবতী নদীর জল আসিয়া সেই সরোবরকে পূর্ণ রাখে। গুরু রাম দাস এই উৎকৃষ্ট সরোবর এখানে খনন করিয়া ইহার নাম অমৃতসর রাখেন। ইহার পূর্ব্ব নাম "চক্" ছিল। সেই সরোবরের মধ্যে উপদ্বীপের ন্যায় শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। একটা সেতু দিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তাহার সম্মুখে একটা বিচিত্রবর্ণ রেশমের বস্ত্রে আবৃত দীর্ঘ স্তূপাকৃতি হইয়া গ্রন্থসকল রহিয়াছে। মন্দিরের এক জন প্রধান শিখ তাহার উপর চামর ব্যজন করিতেছে। এক দিকে গায়কেরা গ্রন্থের গান সকল গাহিতেছে। পঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষেরা আসিয়া মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং কড়ি ও ফুল

ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বা ভক্তিভাবে সঙ্গীত করিতেছে। এখানে যে যখন ইচ্ছা এসো, যে যখন ইচ্ছা চ'লে যাও—কেহ কাহাকে ডাকেও না, কেহ কাহাকে বারণও করে না। এখানে খ্রীষ্টান মুসলমান সকলেই যাইতে পারে—কেবল নিয়ম এই যে, গুরুদ্বারা সীমানার মধ্যে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পারে না। গবর্ণর জেনারল লর্ড লীটন এই নিয়ম রক্ষা না করাতে সকল শিখেরা নিতান্ত অপমানিত ও পরিতাপিত হইয়াছিল। আমি আবার সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরে গেলাম। দেখি যে, তখন আরতি হইতেছে। এক জন শিখ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া গ্রন্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছে। অন্য সকল শিখেরা দাঁড়াইয়া যোড়-করে তাহার সঙ্গে গম্ভীর স্বরে পড়িতেছে—"গগনমে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে, তারকা মণ্ডলো জোঁকা মোতী। ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি। কৈসী আরতি হোবে ভব খণ্ডনা, তেরি আরতি, অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী। হরিচরণ-কমল মকরন্দ লোভিত মনোঽনুদিনো মে আয়ী পিয়াসা, কৃপা-জল দে নানক-সারঙ্গকো যাতে হোবে তেরে নামে বাসা"। "গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে। ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে। কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে। হরি চরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মন, অনুদিন তাহে মোর পিপাসা রে। কৃপা জল দে চাতক নানককে, যেন হয় তব নামে মম বাসা রে"। আরতি শেষ হইল, তখন সকলকে কড়া ভোগ (মোহন-ভোগ) দিতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে এই প্রকার দিন রাত্রি সপ্ত প্রহর ঈশ্বরের উপাসনা হয়—মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে উপাসনা বন্ধ থাকে। ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা মাত্র উপাসনা হয়। আর শিখদিগের হরিমন্দিরে

দিন রাত উপাসনা। কাহারো মন ব্যাকুল হইলে নিশীথ সময়েও সেখানে গিয়া উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। এই সদ্দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মদিগের অনুকরণীয়। এখন আর শিখেদের কোন গুরু নাই। তাহাদের গ্রন্থ সকল তাহাদের গুরুস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের শেষ গুরু—দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ। তিনিই শিখেদের জাতি ভেদ নিবারণ করেন এবং তাহাদের মধ্যে "পাহল" বলিয়া যে দীক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা তিনিই সৃষ্টি করেন। সেই "পাহল" আজও চলিয়া আসিতেছে। যে শিখ হইবে তাহাকে আগে পাহল করিতে হইবে। পাহল প্রথা এইরূপ,—একটা পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে চিনি ফেলিয়া দিতে হয় এবং সেই জল খড়্গ বা ছুরিকার দ্বারা নাড়িতে হয় এবং যাহারা শিখ হইবে তাহাদের গাত্রে তাহা ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার পর তাহারা সেই চিনির জল সকলে এক পাত্রে পান করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সকল জাতিই শিখ হইতে পারে—বর্ণ-বিচার নাই। মুসলমানও শিখ হইতে পারে। শিখ হইলেই তাহার উপাধি সিংহ হইয়া যায়। শিখেদের এই মন্দিরে কোন প্রতিমা নাই। নানক বলিয়া গিয়াছেন যে, "থাপিয়া না যাই, কীতা না হোই, আপি আপ্ নিরঞ্জন সোই"। তাঁহাকে কোথাও স্থাপন করা যায় না, কেহ তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তিনিই সেই স্বয়ম্ভু নিরঞ্জন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নানকের সেই সকল মহৎ উপদেশ পাইয়াও—শিখেরা নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হইয়াও—সেই গুরু দ্বারার সীমানার মধ্যে, এক প্রান্তে শিব-মন্দির স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা কালী দেবীকেও মানিয়া থাকে। "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না"—এই ব্রাহ্ম-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কাহারো পক্ষে বড় সহজ নহে। দোলের সময় এই মন্দিরের মধ্যে বড় উৎসব হয়। সেই সময়ে শিখেরা মদ্যপানে মত্ত হয়। শিখেরা মদ্যপায়ী কিন্তু তাহারা

তামাক খায় না, একেবারে হুঁকা ছোঁয় না, কলিকে ছোঁয় না। আমার বাসাতে অনেক শিখেরা আসিত। আমি তাহাদের কাছে গুরুমুখী ভাষা ও তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করিতাম। তাহাদের মধ্যে বড় ধর্ম্মের উৎসাহ দেখিতে পাইতাম না। এক জন উৎসাহী শিখ দেখিয়াছিলাম, সে আমাকে বলিল—"যো অমৃতরস চাখা নহী রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া"। আমি বলিলাম, উন্‌কা বাস্তে রোণা পিটনা বেফয়েদা নহি।

আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলো মেলো গাছ—জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা—সকলি নূতন—সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল সকল শিশির-জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধুবহন করিত, যখন দূর হইতে পঞ্জাবী-দের সুমধুর সঙ্গীত-স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতালায় বসিত এবং তাহাদের চিত্র বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত। কখন কখন তাহারা ছাদ হইতে নামিয়া বাগানে চরিত। আমি তাহাদের ভাল বাসিয়া কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে যাইতাম। তাহারা ভয় পাইয়া কেকা শব্দ করিয়া কে কোথায় উড়িয়া যাইত। এক জন এক দিন আমাকে বারণ করিল—"অমন করিবেন না, উহারা বড় দুষ্ট। যদি ঠোকর মারে তো একেবারে চোকে ঠোকর মারিবে"। এক দিন মেঘ উঠিল আর দেখি যে, ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া

নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম। দেখিলাম যে, কবীরা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন, মেঘ উঠিলেই ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে—"নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা"। এ তাঁহাদের কেবল মনের কল্পনা মাত্র নহে। ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল। বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল। তখন সূর্য্যের তাপ অনুভব করিলাম। দোতালায় থাকিতাম, একতালায় নামিয়া আইলাম। দুই দিন পরে সেখানেও সূর্য্যের তাপ প্রবেশ করিল। বাড়ীওয়ালাকে বলিলাম—আমি আর এখানে থাকিতে পারি না; ক্রমে উত্তাপ বাড়িতেছে, আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। সে বলিল, "নীচে তয়খানা আছে; গ্রীষ্মকালে সেখানে বড় আরাম"। আমি এত দিনে জানিতাম না যে, ইহার মাটির নীচে আবার ঘর আছে। আমাকে সেই মাটির নীচে লইয়া গেল। সেই নীচে ঠিক তাহার উপরের একতালার মত ঘর। পাশ দিয়া আলোক ও বাতাস আসিতেছে—সে ঘর খুব শীতল। কিন্তু আমার সেখানে থাকিতে পসন্দ হইল না। মাটির ভিতরে ঘরের মধ্যে বন্দীর ন্যায় থাকিতে পারিব না। আমি চাই মুক্ত বায়ু—প্রমুক্ত-গৃহ। আমাকে এক জন শিখ বলিল যে, "তবে শিমলা পাহাড়ে যান, সে বড় ঠাণ্ডা জায়গা"। আমি তাহাই আমার মনের অনুকূল

স্থান ভাবিয়া ১৭৭৯ শকের ৯ই বৈশাখে সিমলার অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া, পঞ্জৌর ছাড়াইয়া ১২ই বৈশাখে কালকা নামক উপত্যকায় আসিয়া পঁহুছিলাম। দেখি যে, সম্মুখে পর্ব্বত বাধা দিয়া রহিয়াছে। আমার নিকটে অদ্য ইহার নূতন মনোহর দৃশ্য বিকশিত হইল। আমি আনন্দে ভাবিতে লাগিলাম যে, কা'ল আমি ইহার উপরে উঠিব, পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিব। এই আনন্দে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। সুখে নিদ্রা হইল—পথের পরিশ্রম দূর হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু বৈশাখ মাসের অর্দ্ধেক চলিয়া গেল, আমি ১৬ই বৈশাখের প্রাতঃকালে একটা ঝাঁপান লইয়া পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। যত উচ্চ পর্ব্বতে উঠি ততই আমার মন উচ্চ হইতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে দেখি যে, আবার আমাকে লইয়া অবতরণ করিতেছে। আমি চাই ক্রমিক উঠিতে, আর এরা আবার আমাকে নামায় কেন? কিন্তু ঝাঁপানীরা আমাকে একেবারে খদে, একটা নদীর ধারে গিয়া নামাইল। সম্মুখে আবার আর একটা উচ্চতর পর্ব্বত; তাহার পাদদেশে এই ক্ষুদ্র নদী। এখন বেলা দুই প্রহর। তখনকার প্রখর রৌদ্রে নিম্ন পর্ব্বত উত্তপ্ত হইয়া আমাকে বড়ই পীড়িত করিল। সমভূমির উত্তাপ বরং সহ্য হয়, আমার এ উত্তাপ অসহ্য হইল। এখানে একটি ছোট মুদির দোকান, তাহাতে বিক্রয়ের জন্য মক্কার খই রহিয়াছে। আমার বোধ হইল, এই রৌদ্রে মক্কা আপনিই খই হইয়া গিয়াছে। সেই নদীর ধারে আমাদের রান্না ও আহার হইল। আমরা নদী পার হইয়া এখন আবার সম্মুখের পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম এবং শীতল স্থান প্রাপ্ত হইলাম। হরিপুর নামক একটা স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন সকালে চলিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নে একটা বৃক্ষতলে আহার করিয়া সন্ধ্যার সময়ে শিমলার বাজারে উপস্থিত হইলাম। আমার ঝাঁপান বাজারেই রহিল, দোকানদারেরা আমার প্রতি হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। আমি ঝাঁপান হইতে উঠিয়া দোকানে তাহাদের জিনিস পত্র দেখিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী কিশোরী নাথ চাটুয্যে বাসার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল এবং সেই বাজারেই এক বাসা স্থির করিয়া শীঘ্রই আমাকে সেখানে লইয়া গেল।

সেইখানে আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। অনেক বাঙ্গালীর সেখানে কর্ম্ম কাজ, তাহারা অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইল। প্যারি মোহন বাঁড়ুয্যা প্রত্যহ আমার সংবাদ লইতে আসিতেন। তিনি সেখানে ইংরাজের একটা দোকানে কর্ম্ম করিতেন। তিনি এক দিন আমাকে বলিলেন যে, "এখানে একটি বড় সুন্দর জল-প্রপাত আছে, যদি আপনি যান তো আপনাকে তাহা দেখাইয়া আনিতে পারি"। তাঁহার সঙ্গে আমি খদে নামিয়া তাহা দেখিতে গেলাম। খদের নীচে যাইতে যাইতে দেখি যে, মধ্যে মধ্যে সেখানে লোকের বসতি, মধ্যে মধ্যে শস্য-ক্ষেত্র। কোন খানে গোরু মহিষ চরিতেছে, কোন খানে পার্ব্বতীয় মহিলারা ধান ঝাড়িতেছে। আমি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখানেও দেশের মত গ্রাম ও ক্ষেত্র আছে, তাহা আমি এই প্রথম জানিতে পারিলাম। এইরূপে দেখিতে দেখিতে খদের নিম্নতম স্থানে গিয়া আমাদের ঝাঁপান রাখিলাম, আর ঝাঁপান যাইবার পথ নাই। আমরা এখন পার্ব্বতীয় লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই জল-প্রপাতের নিকটে শিলাতলে উপস্থিত হইলাম। এখানে তিন শত হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে জলধারা পড়িতেছে এবং প্রস্তরের উপরে প্রতিঘাত পাইয়া রাশি রাশি ফেণা উদ্গীরণ করিতেছে এবং বেগে স্রোত নিম্নমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি একখানা শিলাতলে বসিয়া এই জল-ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। যেমন এই জলপ্রপাতের অতি শীতল কণা সকল খদে নামিবার পরিশ্রমে আমার ঘর্ম্মাক্ত শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি আমার চক্ষে অন্ধকার ঠেকিল। আমি ধীরে ধীরে সেই শিলাতলে অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণেক পরে আমার চৈতন্য হইল—আমি চক্ষু মেলিলাম। দেখি যে, আমার সঙ্গী প্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ একেবারে শুষ্ক, তিনি বিষণ্ণ মনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি অমনি আমার ও

তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিলাম এবং তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য হাসিয়া উঠিলাম। আমি এইরূপে জল-প্রপাত দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আইলাম। তাহার পরের রবিবারে আবার আমরা কয়েক জন সেই জল-প্রপাতের ধারে বন-ভোজন করিবার জন্য গেলাম। আমি গিয়া সেই জল-প্রপাতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার মস্তকে তিন শত হস্ত উচ্চ হইতে সেই জল-ধারা পড়িতে লাগিল। পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে হিম জল-কণা সকল আমার প্রতি লোম-কূপ ভেদ করিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আইলাম। কিন্তু এ বড় আমার আমোদ হইল, আমি আবার তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এইরূপে জল-প্রপাতের ধারার মধ্যে আমার স্নান হইল। আমরা সেই পর্ব্বতের বনে কত আনন্দে বন-ভোজন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাসাতে ফিরিয়া আইলাম। আমার বাম চক্ষুতে একটু পীড়া ছিল, পর দিন প্রাতে দেখি, তাহা আরক্ত বর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। উপবাস করিয়া চক্ষু-রোগ আরাম করিলাম। ৩রা জ্যৈষ্ঠ সেই রোগ-শান্তির পর সুস্থতার হিল্লোলে আমার শরীর মন বড়ই প্রসন্ন হইল। আমি মুক্ত-দ্বার গৃহের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে চিন্তা করিতেছি যে, এই শিমলার গৃহে আমি চির জীবন সুখে কাটাইতে পারি। এমন সময়ে আমার ঘরের নীচে দেখি যে, রাস্তা দিয়া কতকগুলা লোক দৌড়িয়া যাইতেছে। আমি তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কি হইয়াছে, এত দৌড়িতেছ কেন? উত্তর না দিয়া তাহার মধ্যে এক জন আমাকে হাত নাড়িয়া বলিল—"পলাও পলাও"। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন পলাইব? কিন্তু কে কার উত্তর দেয়, সকলেই আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। আমি ইহার কিছুই ভাব বুঝিতে না পারিয়া, প্যারী বাবুর নিকট তথ্য জানিতে চলিলাম। গিয়া দেখি, তিনি দেওয়ালের চূণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোটা

করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকাণের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "গুরখারা বামুন মানে"। জিজ্ঞাসা করিলাম, হয়েছে কি? তিনি বলিলেন যে, "গুরখা সৈন্যেরা শিমলা লুঠ করিবার জন্য আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি খদে যাইব"। আমি বলিলাম যে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এই কথায় তাঁহার মুখ আরও শুকাইল। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি একাকী খদে পলাইয়া থাকেন—দুই জন একত্রে গেলে পাহাড়িদের লোভ বাড়িবে, তাতে বাঁচা ভার হইবে। আমি তাঁহার ভাব বুঝিয়া বলিলাম, না, আমি খদে যাইব না। আমি বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি যে, আমাদের বাসার তালা বন্ধ। আমি ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। একটু পরেই কিশোরী আসিয়া বলিল যে, "টাকার থোলেটা আমি উননের ধারে মাটিতে পুঁতিয়া তাহার উপর কাঠ চাপাইয়া রাখিয়াছি, আর গুরখা চাকরটাকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া চাবি দিয়াছি; গুরখারা গুরখা দেখিলে কিছু বলিবে না। আমি বলিলাম, তাহাতো হইল, তোমার নিজের প্রাণের জন্য কি করিতেছ? সে বলিল, "রাস্তার ধারে যে এই নর্দ্দমাটা আছে, গুরখারা আসিলে তাহার মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়া থাকিব—আমাকে কেউ দেখিতে পাইবে না।" গুরখারা বাস্তবিক আসিতেছে কি না, একটা উচ্চস্থানে উঠিয়া তাহা আমি দেখিতে গেলাম। সেখানে গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল—যদি গুরখারা শিমলা আক্রমণ করিতে আসে, তবে সকলকে জানাইবার জন্য তোপ পড়িবে।" দেখি যে, খানিক পরে ভয়ানক তোপও পড়িল। তখন আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। রাত্রি হইল, কোন উপদ্রবই নাই; আমি গৃহে গিয়া নিরাপদে শয়ন করিলাম।

প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি যে, আমি বাঁচিয়া আছি, গুরখারা আক্রমণ করে নাই। বাহিরে গিয়া দেখি যে, গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরি প্রভৃতি সকল কার্য্যালয়ে এবং রাস্তায় বন্দুকধারী গুরখার পাহারা।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১লা জ্যৈষ্ঠ দিবসে শিমলাতে সংবাদ আইল যে, সিপাইরদের বিদ্রোহে দিল্লী ও মিরাটে একটা ঘোরতর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠতে কামাণ্ডার ইন্‌চিফ্ জেনারল আর্সন দাড়ি কামাইয়া একটা বেতো ঘোড়ায় চড়িয়া শিমলা হইতে নীচে চলিয়া গেলেন। শিমলার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে একদল গুর্খা সৈন্য ছিল, তিনি যাইবার সময় সেই গুর্খা সৈন্যদলের কাপ্তানকে হুকুম দিয়া গেলেন যে, "গুর্খা সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিও।" গুর্খারা নির্দ্দোষ, তাহাদের সঙ্গে সিপাহিদিগের যোগ নাই, কোন সম্বন্ধ নাই। সাহেবেরা জানেন যে, কালাসিপাই সবই এক। বুদ্ধির দোষে গুর্খাদিগকে নিরস্ত্র করিবার হুকুম হইল। কাপ্তান যেই গুর্খাদিগকে বন্দুক রাখিতে হুকুম দিলেন, অমনি তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। তাহারা ভাবিল যে, প্রথমে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পরে তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবে। এই ভাবিয়া তাহারা প্রাণের দায়ে সকলে একমত, একজোট হইল। তাহারা কাপ্তানের হুকুম মানিল না, বন্দুক রাখিল না। পরন্তু তাহারা ইংরাজ আফিসরদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠতে শিমলা আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল। এই সংবাদে শিমলার বাঙ্গালীরা তাহাদের পরিবার লইয়া উৎকন্ঠিত ও ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। এখানকার মুসলমানেরা মনে করিল যে, তাহাদের রাজ্য আবার তাহারা ফিরিয়া পাইল। একজন দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড দাড়ীওয়ালা ইরাণী কোথা হইতে বাহির হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিতে লাগিল, "মুসলমানকো হারাম খেলায়া, হিন্দুকো গৌ খেলায়া; আব্ দেখ্ লেঙ্গে কৈসে ফিরিঙ্গী হ্যায়"। এক জন

বাঙ্গালী আসিয়া আমার কাছে বলিল, "আপনি নিরূপদ্রবে বেশ বাড়ীতে ছিলেন—এ উপদ্রবে কেন এখানে এলেন। আমরা এ পর্য্যন্ত এমন উপদ্রব দেখি নাই"। আমি বলিলাম, "আমি একলা মানুষ, আমার ভাবনা কি? কিন্তু যাঁহারা পরিবার লইয়া এখানে রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই জন্য ভাবিতেছি। তাঁহাদেরই মহা বিপদ।" তথাকার সাহেবেরা শিমলা রক্ষা করিবার জন্য একত্র হইয়া, কতকগুলা বন্দুক লইয়া একটা উচ্চ পাহাড়ে চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বিবিদের সঙ্গে বসিয়া রহিল। সিমলা রক্ষা করিবেন কি, সেখানে তাঁহারা মদ্য পানে মত্ত হইয়া আমোদ, কোলাহল ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তথাকার কমিশনর সুধীর ও কার্য্য-কুশল লর্ড হে সাহেবই শিমলা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন গুর্খা সৈন্যের শিমলাতে আগমন সূচক তোপ পড়িল, তখন তিনি নিজের প্রাণের ভয় ত্যাগ করিয়া সেই মাহুত বিহীন প্রমত্ত হস্তীযূথের ন্যায় সৈন্যদলের সম্মুখে মাথার টুপী খুলিয়া সেলাম করিতে করিতে উপ-স্থিত হইলেন এবং বিনয়ের সহিত আশ্বাসবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া শিমলাতে আসিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে ট্রেজরী প্রভৃতি রক্ষণের ভার তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে সেখানকার সাহেবরা লর্ড হে সাহেবের প্রতি ভারি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল—"লর্ড হে সাহেব কিছুই বিবেচনা করিলেন না, তিনি আমা-দের ধন, প্রাণ, মান সকলি বিদ্রোহী শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করি-লেন, তাহাদিগের নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়া ইংরাজ জাতির কলঙ্ক করিলেন। তিনি আমাদের প্রতি ভার দিলে আমরা তাহা-দিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিতাম"। আমাকে এক জন বাঙ্গালী আসিয়া বলিল, "মহাশয়! গুর্খারা যদিও সব অধিকার পাইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাদের রাগ পড়ে নাই। তাহারা ইংরাজদিগকে বড়ই গালি দিতেছে"। আমি বলিলাম, "উহাদের রক্ষক নাই—

কাপ্তান হীন সেনা ; এখন বকুক ; আবার সব শান্ত হইয়া যাইবে।" কিন্তু সাহেবেরা একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহারা নিরাশ হইয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, গুর্খারা যখন শিমলা অধিকার করিয়াছে, তখন পলায়ন ব্যতীত প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা শিমলা হইতে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই প্রহরের সময় দেখি যে, দাণ্ডি নাই, ঝাঁপান নাই, ঘোড়া নাই, সহায় নাই, এমন অনেক বিবি খদ দিয়া ভয়ে দৌড়িতেছে। কেবা কাহাকে দেখে, কেবা কাহার তত্ত্ব লয় ? সকলে আপনার আপনারই প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। শিমলা একেবারে সন্ধ্যার মধ্যে লোক শূন্য হইয়া পড়িল। যে শিমলা মনুষ্যের কোলাহলে পূর্ণ ছিল, তাহা আজ নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। কেবল কাকের কা কা ধ্বনি শিমলার বিশাল আকাশকে পূর্ণ করিতেছে! শিমলা যখন একেবারে মানবশূন্য হইল, তখন অগত্যা আমাকে আজ শিমলা ছাড়িতে হইবে। যদিও গুর্খারা কোন অত্যাচার না করে, তথাপি খদ হইতে উঠিয়া পাহাড়ীরা সব লুঠ করিয়া লইতে পারে। তবে আজ বেহারা কোথায় পাওয়া যায় ? সওয়ারি না পাইলেও শিমলা হইতে যে হাঁটিয়া পলাইতে হইবে, আমার এত ভয় হয় নাই। এই সময়ে একটা রক্ত-চক্ষু দীর্ঘ কৃষ্ণ পুরুষ আসিয়া আমাকে বলিল—"কুলিকা দরকার হ্যায় ? কুলি চাহিয়ে ?" আমি বলিলাম হাঁ, চাহিয়ে। বলিল, কয় ঠৌ ?" বলিলাম, বিশঠৌ কুলি চাহিয়ে। "আচ্ছা হাম লাকে দেগা, হামকো বক্সিষ দেনে হোগা," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে সওয়ারীর জন্য আমি একটা দোলা সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। আমি রাত্রিতে আহার করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে, তখন, "দরজা খোলো—দরজা খোলো" শব্দের সহিত দুয়ারে ধাক্কা পড়িতে লাগিল। বড়ই কোলাহল হইতে লাগিল। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, অত্যন্ত

ভয় হইল—বুঝি এইবার গুর্খাদের হস্তে মারা পড়িলাম। আমি ভয়ে ভয়ে দুয়ারটা খুলিয়া দিলাম। দেখি যে, দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ লোকটা বিশ জন কুলি লইয়া ডাকাডাকি করিতেছে। আমি প্রাণের ত্রাস হইতে রক্ষা পাইলাম। তাহারাই আমার রক্ষক হইয়া ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি শুইয়া রহিল। আমার প্রতি ঈশ্বরের যে করুণা, তাহা একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রভাত হইল, আমি শিমলা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলিরা বলিল যে, অগ্রে টাকা না পাইলে তাহারা যাইবে না। আমি টাকা দিবার জন্য কিশোরি, কিশোরি করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় কিশোরী? তাহার কাছে খরচের টাকা ছিল, আর আমার কাছে একটা বাক্সভরা এক বাক্স টাকা ছিল। ভাবিয়াছিলাম, এত টাকা কুলিদিগকে দেখাইব না। কিন্তু কিশোরী নাই, কুলিরাও টাকা ব্যতীত উঠে না। আমি তখন তাহাদিগের সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া প্রতি জনকে তিনটা করিয়া টাকা দিলাম। সেই সর্দ্দারটাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলাম, এমন সময়ে কিশোরী উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম "এমন সঙ্কট সময়ে তুমি এখান হইতে কোথায় গিয়াছিলে?" বলিল যে, একটা দরজি আমার কাপড় শেলাইয়ের দর চারি আনা অধিক চায় বলিয়া তাহা চুকাইতে এত বিলম্ব হইয়া গেল"। আমি এখন সেই দোলায় চড়িয়া ডগসাহী নামক আর একটা পর্ব্বতে চলিলাম। সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় কুলিরা আমাকে একটা প্রস্রবণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে বসিল এবং তাহারা পরস্পর কথা বার্ত্তা ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলাম যে, ইহারা হয় তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়া এই সকল টাকা লইবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। ইহারা এখন এই জনশূন্য অরণ্য হইতে আমাকে খদে ফেলিয়া দিলে আর কেহই জানিতে পারিবে না।

এ কেবল আমার মনের বৃথা আতঙ্ক। তাহারা জল পান করিয়া পুনর্ব্বার সবল হইয়া আমাকে একটা বাজারে লইয়া দুই প্রহর রাত্রিতে নামাইল। সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। আমার পকেটের কতকগুলা টাকা পয়সা বিছানাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেখি যে, সেই কুলিরা সেই সব কুড়াইয়া আনিয়া আমাকে দিল। তাহাতে তাহাদের উপরে আমার বড়ই বিশ্বাস জন্মিল। আমি মধ্যাহ্নকালে ডগসাহীতে পঁহুছিলাম। তাহারা আমাকে একটা খোলার ঘরে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী সন্ধ্যার সময়ে আমার কাছে পঁহুছিল। খদের ধারে একটা গোয়ালার বাড়ীর উপরে একটা ভাঙ্গা ঘর থাকিবার জন্য পাইলাম এবং শয়নের জন্য একখানা দড়ির খাটিয়া পাইলাম। ইহাতেই সেই রাত্রি যাপন করিলাম। তাহার পর আমি সকালে উঠিয়া পর্ব্বতের চূড়াতে চলিয়া গেলাম। দেখি, সেই চূড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্যেরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা একটা খোলা তরয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেই বাক্সের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং অতি ভয়ে ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম এ বা আমার উপরে তাহার তলওয়ার চালায়। কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুর্খারা কি এখানে আসিতেছে?" আমি বলিলাম "না, এখন এখানে আসে নাই"। আমি সেখান হইতে বাহিরে আসিলাম এবং খুঁজিয়া একটি ক্ষুদ্র গুহা পাইলাম, তাহার মধ্যে ছায়াতে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাকালে নীচে পর্ব্বতে আসিয়া সেই গৃহে শয়ন করিলাম। সেই রাত্রিতে অল্প বৃষ্টি হইল আর সে ঘরের ঘরত্ব থাকিল না। ভাঙ্গা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে আমার সেই বনবাসে

দিন রাত্রি কাটিয়া যাইত। কাবুল লড়াইয়ের ফেরতা ঘোষজা ও বসুজা দুই জন এই ডগসাহীতে এখন ডাকঘরের কর্ম্ম করেন। তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন। বসুজা বলিলেন, "আমি কাবুলের লড়াই হইতে বড় বেঁচে এসেছি। পলাইয়া আসিবার সময় কাবুলের পথে একখানা শূন্য ঘর দেখিতে পাইয়া আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং একটা মাচার উপর উঠিয়া লুকাইয়া রহিলাম। সেখানে কাবুলীরা আমাকে দেখিতে পাইয়া মারে আর কি। অনেক কষ্টে বাঁচিয়া আসিয়াছি। আবার এখন্ এই বিপদ।" আমি সেখানে যে কয়দিন ছিলাম, প্রতি দিন ঘোষজা আমার তত্ত্ব লইতেন। আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোষজা, আজিকার খবর কি?" তিনি বলিলেন, "আজিকার খবর বড় ভাল নয়। আজ সব ডাক জ্বালাইয়া দিয়াছে"। তাহার পর দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোষজা, আজিকার কি খবর"? বলিলেন, আজিকার বড় ভাল খবর নয়। আজ জলন্ধর হইতে বিদ্রোহীরা আসিতেছে।" ঘোষজার নিকট হইতে এক দিনও ভাল খবর পাওয়া যায় না। তিনি প্রতি দিনই মুখ ভার করিয়া আসেন। আমি এইরূপে অতি কষ্টে এগারো দিন অতিবাহিত করিলাম। এখন সংবাদ আইল যে, শিমলা নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে। আর কোন ভয় নাই। আমি শিমলা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম। কুলি আনিতে পাঠাইলাম, শুনিলাম কুলি নাই। ওলাউঠার ভয়ে তাহারা পলাইয়াছে। একটা ঘোড়া পাইলাম। সেই ঘোড়াতে বৈকালে সওয়ার হইয়া চলিলাম। খানিক দূর আসিয়া রাত্রিতে একটা আড্ডায় থাকিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আমি আবার সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে লাগিলাম। কিশোরীকে আর আমার সঙ্গে পাইলাম না। সেই আবরণহীন পর্ব্বতে তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই প্রখর হইয়াছে। একটু ছায়ার জন্য আমি লালায়িত হইলাম, কিন্তু একটি

বৃক্ষ নাই যে, আমাকে একটু ছায়া দেয়। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে আর একটি মানুষ নাই যে, একবার ঘোড়াটা ধরে। আমি সেই অবস্থায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত চলিয়া একটা বাঙ্গালা পাইলাম। ঘোড়াটিকে এক স্থানে বাঁধিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। একটু জল চাহিতেছি, দৈবক্রমে পলায়িতা একটি বিবি সেখানে ছিলেন, তিনি সমদুঃখে দুঃখী হইয়া আমার জন্য একটু মাখন ও তপ্ত আলু আর একটু জল পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা খাইয়া ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিলাম। সন্ধ্যার সময়ে শিমলাতে পঁহুছিলাম। দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছি, কিশোরি, আছ এখানে? এখানে কি আছ? দেখি যে, কিশোরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমি ডগসাহী হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে শিমলায় ফিরিয়া আইলাম।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি শিমলাতে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরী নাথ চাটুয্যেকে বলিলাম, আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত ভ্রমণে যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য একটা ঝাঁপান ও তোমার জন্য একটা ঘোড়া ঠিক্ করিয়া রাখ। "যে আজ্ঞা," বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দিবস শিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত, বাঙ্গীবর্দ্দারেরা সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, তোমার ঘোড়া কোথায়? "এই এলো বো'লে, এই এলো বো'লে," বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব আর সহ্য হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক শীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী ভ্রমণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পেটরার ও বাক্সর যে সকল চাবি আছে, তাহা আমাকে দাও।" আমি তাহার নিকট হইতে সেই সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বসিলাম। বলিলাম, ঝাঁপান উঠাও। ঝাঁপান উঠিল, বাঙ্গীবর্দ্দারেরা বাঙ্গী লইয়া চলিল, হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আনন্দে, উৎসাহে বাজার দেখিতে দেখিতে শিমলা ছাড়াইলাম। দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্ব্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্ব্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন

হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমার কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ঝাঁপানীরা বলিল, "যদি এই ভাঙ্গা পুলের কার্নিশ দিয়া একা একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।" আমার তখন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। কার্নিশের উপরে একটি মাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ানক গভীর খদ—ঈশ্বর-প্রসাদে আমি তাহা নির্ব্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিলাম। ঈশ্বর-প্রসাদে যথার্থই "পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিং" আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না। তথা হইতে ক্রমে পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্ব্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচের খদের কেলু গাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আইল। সোজা খাড়া পর্ব্বত, নীচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে ভয়ে এ সঙ্কট পথটা ছাড়াইলাম। দুই প্রহরের পর একটা শূন্য পান্থ-শালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলাম। আমার সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হাম লোককা রোটী বড়া মিঠা হ্যায়"। আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মক্কা যব মিশ্রিত একখানা রুটী লইয়া তাহারই একটু খাইয়া সে দিন কাটাইলাম। তাহাই আমার যথেষ্ট হইল। "রুখা শুখা গমকি টুকরা, লোনা বা আলোনা ক্যা। শের দিয়া তো রোনা ক্যা।" খানিক পরে কতক গুলা পাহাড়ীরা নিকটস্থ গ্রাম হইতে আমার নিকটে আসিল এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল।

ইহাদের এক জনের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাহার নাক নাই, মুখখানা একেবারে চেপটা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোম্‌হারা মুখমেঁ ইয়ে ক্যা হুয়া? সে বলিল, আমার মুখে একটা ভালুকে থাবা মারিয়াছিল—আমার সম্মুখের একটা পথ দেখাইয়া বলিল, "ঐ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে গিয়া সে থাবা মারিয়া আমার নাকটা উঠাইয়া লইয়াছে"। সেই ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ। আমি সেই পাহাড়ী-দের সরল প্রকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। পর দিন প্রাতঃ-কালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপরাহ্ণে একটা পর্ব্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলা লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্ব্বদাই চলিতে হয়, ক্ষেতের সময় শূকর ও ভালুক আসিয়া সব ক্ষেত নষ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি"। সেই পর্ব্বতের খদেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা আমাকে বলিল, "আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আমাদের বাড়ীতে সুখে থাকিতে পারিবেন, এখানে থাকিলে আপ-নার কষ্ট হইবে"। আমি কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের গ্রামে গেলাম না। সে পাকদণ্ডীর পথ, বড় কষ্টে উঠিতে নামিতে হয়। আমার যাইবার উৎসাহ সত্ত্বেও দুর্গম পথ বলিয়া গেলাম না। তাহাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। পাণ্ডবদের মত তাহারা সকল ভাই মিলে এক জন স্ত্রীকে বিবাহ করে। সেই স্ত্রীর সন্তানেরা সকল ভাইকেই বাপ বলে। আমি সে দিন সেই চূড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন, দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। বলিল, "পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর ঝাঁপান চলে না।" এখন কি করি?

পথটা চড়াইয়ের পথ, কোন পাকদণ্ডীও নাই। ভাঙ্গা পথ, ঊর্দ্ধের দিকে কেবল পাথরের উপরে পাথরের ঢিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথ সঙ্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম—এক জন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া চলিয়া সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম। সে ঘরে একখানা কৌচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্য এক বাটী দুগ্ধ আনিল; কিন্তু অতি পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুগ্ধ খাইতে পারিলাম না। সেই যে কৌচে পড়িয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, একবারও উঠিলাম না। প্রাতে শরীরে একটু বল আইল, ঝাঁপানীরা এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আরো উপরে উঠিয়া সেই দিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিক্য বোধ হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে; তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে, অনেক তরুণবয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল

হরিতবর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষেতেঁ হরিতবর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধপ্রকারের তৃণ লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর একপ্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি ফলসকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই—আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে, তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের

উপর না জানি তোমার কত করুণা! তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।

هرگزم مهر تو از لوح دل و جان نرود
انچنان مهر توام در دل و جان جائے گرفت
که گرم سر برود مهر تو از جان نرود

হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্য অস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে সুঙ্ঘী নামক পর্ব্বত চূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন্ চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্ব্বত শ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান। কোন পর্ব্বতের আপাদ-মস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক একগ্রামে দশ বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্য-কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্ব্বত আপাদ-মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্ব্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ-ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত,—একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্য-বসতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে যে পর্ব্বত ঘনাকীর্ণ, সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ঝাউ-গাছের পত্রের ন্যায় অথচ সূচী প্রমাণ দীর্ঘমাত্র ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখা সকল শীতকালে বহু তুষার ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্র সকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়—কখনো আপনার হরিতবর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য! এই পর্ব্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? এই কেলু বৃক্ষের কোন পুষ্প হয় না। ইহা বনস্পতি এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাতে আল্‌কাতরা জন্মে। কতক দূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিলাম। এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পথে এক পাল অজা অবি চলিয়া যাইতেছিল, আমার ঝাঁপানী একটা দুগ্ধবতী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল এবং বলিল যে, "ইস্‌সে দুধ মেলে গা।" আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম। উপাসনার পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে

পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। "সবানা জীয়াকা তুম্ দাতা, সো মৈ বিসর না যাই" সকল জীবের তুমি দাতা তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই। তাহার পরে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম, পুনর্ব্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে আফিমের ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য কর্ত্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রের জন্য পুনর্ব্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালি নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সুঙ্গ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্নে। এই পর্ব্বতের তলে নগরী নদী এবং ইহার নিকটেই অন্যান্য পর্ব্বত তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। বোয়ালি পর্ব্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে এবং তাহা রৌপ্য-পত্রের ন্যায় সূর্য্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। এই শতদ্রু নদী তীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাই-তেছে, তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহুপথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে এবং ইংরাজী ভাষাও অল্প অল্প শিখিয়াছেন। শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী শোহিনী হইয়া তাহার নিম্নে বিলাস-পুরে যাইয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে।

গত কল্য সুঙ্গ্রী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্যও তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্নে নগরী নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহা

বেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তর-খণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেণময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দ-করতঃ সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র সমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্ব্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পর পারে গিয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করি-লাম। এই উপত্যকা ভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ-ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে এক জন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে—সে পর্ব্বতের গহ্বর—সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর একটি ছেলে পর্ব্বতের উপরে সঙ্কট স্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করি-তেছে। তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তি সুখ দুর্ল্লভ। আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতে ছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান" পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্র বেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদী তীর পর্য্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষ সকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল এবং অন্ধ

তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষ সকল দেখিয়াছি এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্ব্বতের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল; রাত্রিতে যখনই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনি তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং উৎসব রজনীর প্রভাত কালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায় মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভুক, লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে। আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটি করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুই প্রহরের সময় দারুণ ঘাট নামক দারুণ উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণ ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষার বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার বর্ষণ শিমলাবাসিদিগের পক্ষেও আশ্চর্য্য, যেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই শিমলা পর্ব্বত তুষার-জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্ত-বেশ ধারণ করে। ২রা আষাঢ়ে এই পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া

সিরাহন নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাণার একটি অট্টালিকা আছে, গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখন কখন শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত তলে আমাদিগের দেশ অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ হয়, পর্ব্বত চূড়াতেই বারোমাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে। ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে পত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩ই আষাঢ়ে ঈশ্বর প্রসাদাৎ নির্ব্বিঘ্নে আমার শিমলার প্রবাস ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম। কিশোরী দরজা খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "তোমার মুখ যে একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।" সে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না, যখন আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম এবং আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, তখন আমি অনুশোচনা ও অনুতাপে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি আর এখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি পর্ব্বত হইতে নামিয়া জ্বালামুখী চলিয়া গেলাম। জ্বালামুখীর অগ্নির তাপে, জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে আমার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। আমি তাই কালামুখ হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে। আমি আপনার নিকট বড় অপরাধী ও দোষী হইয়াছি। আমার আশা নাই যে, আপনি আর আমাকে আপনার নিকট রাখিবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেমন আমার কাছে ছিলে তেমনি আমার কাছে থাক।" সে বলিল, আমি নীচে যাইবার সময় একটা চাকর বাসায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি যে, সে চাকর পলাইয়া গিয়াছে। দরজা সব বন্ধ, আমি দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমাদের কাপড় ও বাক্স পেটরা সকলই আছে, কিছুই লইয়া যায় নাই। আমি তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছি।" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া

চমকিয়া উঠিলাম। যদি আমি তিন দিন পূর্ব্বে এখানে আসিতাম তবে বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হইত। এই বিংশতি দিবসের পর্ব্বত ভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাস সুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র ও উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না। আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমগান করিতে লাগিলাম।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন হিমালয়ে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের জল-যন্ত্র দিবা নিশি চলিতে লাগিল। চিরকাল মেঘ ঊর্দ্ধে দেখিয়া আসিয়াছি, এখন দেখি, অধস্তন পর্ব্বতের পাদমূল হইতে শ্বেত বাষ্পময় মেঘ উঠিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ক্রমে ক্রমে তাহা পর্ব্বত শিখর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋষি-কল্পিত ইন্দ্রের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করিলাম। খানিক পরেই বৃষ্টি হইয়া মেঘ পরিষ্কার হইয়া গেল। আবার পর্ব্বত হইতে তুলা-রাশির ন্যায় মেঘ উঠিয়া সকল আচ্ছন্ন করিল। তার পরেই বৃষ্টি হইয়া আবার সূর্য্যের প্রকাশ হইল। এই প্রকারে ঈশ্বরের জল-যন্ত্র দিবা নিশি কার্য্য করিতে লাগিল। শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতে হয়তো এক পক্ষ চলিয়া গেল, সূর্য্যের সঙ্গে আর দেখা হইল না। তখন মেঘে সকল এমনি আবৃত, যেন দশ হাত দূরে আর সৃষ্টি নাই। আমি আছি, আর আমার সঙ্গে কেবল ঈশ্বর আছেন। তখন সহজেই আমার মন সংসার হইতে উপরত হইল, তখন সহজেই আমার আত্মা সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে বিশ্রাম করিল। ভাদ্র মাসে হিমালয়ের জটা-জূটের মধ্যে জল-কল্লোলের বিষম কোলাহল, তাহার প্রস্রবণ সকল পরিপুষ্ট, নির্ঝর সকল প্রমুক্ত, পথ সকল দুর্গম। এখানে আশ্বিন মাসে শরৎকালের তেমন কিছুই বিকাশ নাই। কার্ত্তিক মাস হই-তেই শীতল বায়ু অনাবৃত শরীরকে শীতার্ত্ত করিতে লাগিল, অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই এক প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া উৎফুল্ল নেত্রে দেখি যে, পর্ব্বত তল হইতে শিখর পর্য্যন্ত বরফে আবৃত হইয়া সকলি শ্বেত। গিরিরাজ

শুভ্র রজত বসন পরিধান করিয়াছেন। বরফে শীতল বায়ুর নিঃশ্বাস আমি এই প্রথম উপভোগ করিলাম। দিন যত যাইতে লাগিল, শীত ততই বাড়িতে লাগিল। এক দিন দেখি যে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে ধূনিত লঘু তুলার ন্যায় বরফ পড়িতেছে। জমাট বরফ দেখিয়া মনে ছিল যে, বরফ প্রস্তরের ন্যায় ভারি এবং কঠিন, এখন দেখি যে, তাহা তুলার ন্যায় পাতলা ও হালকা। বস্ত্র ঝাড়িয়া ফেলিলেই বরফ পড়িয়া যায় এবং যেমন শুষ্ক তেমনি শুষ্কই থাকে। পৌষ মাসের এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, দুই তিন হাত বরফ পড়িয়া সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মজুরেরা আসিয়া সেই বরফ কাটিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিলে তবে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। আমি কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া সেই বরফের পথেই চলিলাম। প্রাতে আর বেড়ান বন্ধ হইল না। স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে আমি এত দূর এত বেগে চলিয়া গেলাম যে, সেই শীত-কালে বরফের মধ্যে আমি গ্রীষ্ম অনুভব করিলাম এবং ভিতরের বস্ত্র ঘর্ম্মে আর্দ্র হইয়া গেল। তখনকার আমার শরীরের বল ও সুস্থতার এই পরিচয়। প্রতি দিন প্রাতঃকালেই আমি এইরূপ আনন্দে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিতাম এবং পরে চা ও দুগ্ধ পান করিতাম। দুই প্রহরের সময়ে স্নানে বসিয়া বরফ মিশ্রিত জল আপনাপনি মস্তকে ঢালিয়া দিতাম। নিমেষের জন্য আমার হৃদয়ের শোণিত চলা বন্ধ হইত এবং পরক্ষণেই তাহা দ্বিগুণ বেগে চলিয়া আমার শরীরে সমধিক স্ফূর্ত্তি ও তেজের সঞ্চার করিত। পৌষ মাঘ মাসের শীতেতেও আমি গৃহে আগুণ জ্বালাইতে দিতাম না। শীত কতদূর শরীরে সহ্য হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবার জন্য, আমি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। রাত্রিতে আমি আমার শয়ন ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতাম; রাত্রির সেই শীতের বাতাস আমার বড়ই ভাল

লাগিত। আমি কম্বল জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সঙ্গীত ও হাফেজের কবিতা গান করিতাম—"যোগী জাগে—ভোগী রোগী কোথায় জাগে। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস পান, প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে"।

یارب آن شمع شب افروز ز کاشانهٔ کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانهٔ کیست

"যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ঘরে? আমার তো তাতে প্রাণ দগ্ধ হ'লো, জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হ'লো কার?" যে রাত্রিতে তাঁহার ঘনিষ্ট সহবাস অনুভব করিতাম, মত্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম—

گو شمع میارید درین جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

"আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।'

রাত্রি তো এইরূপে আনন্দে কাটাইতাম, দিনের বেলায় গভীর ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। প্রতি দিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমি দৃঢ় আসন-বদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মার মূল তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, যাহা মুলতত্ত্ব তাহার উল্টা ভাবনা মনেতেও স্থান পাইতে পারে না। তাহা কোন মনুষ্যের ব্যক্তিগত সংস্কার নহে, তাহা সকল কালে নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববাদী সম্মত। মূলতত্ত্বের প্রামাণিকতা আর কাহারো উপর নির্ভর করে না—তাহা আপনি আপনার প্রমাণ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতুক ইহা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। এই মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদের পূর্ব্বকার ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—"দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং"। পরম দেবেরই এই মহিমা, যাঁহার দ্বারা এই

বিশ্ব-চক্র ভ্রাম্যমান হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিতেরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে—জড়ের অন্ধ-শক্তিতে; কেহ কেহ বা বলেন, কোন কারণ ব্যতীত কেবল কালেরই প্রভাবে এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে। কিন্তু আমি বলি—পরম দেবেরই এই মহিমা যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্র চালিত হইতেছে। "স্বভাবমেকে কবয়োরদন্তি কালস্তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং" ॥ "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং" ॥ যাহা এই কিছু সমুদায় জগৎ প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে এবং প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে "এষ দেবোবিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সর্ব্বদা লোকদিগের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। মূলতত্ত্বের এই অকাট্য সত্যসকল ঋষিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

সম্মুখে বৃক্ষ যে আছে তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি, কিন্তু সেই বৃক্ষ যে আকাশে আছে সে আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে; এ সকল দেখিতেছি, কিন্তু তাহার সূত্র সেই কালকে দেখিতে পাই না। বৃক্ষ যে জীবনী-শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, যে শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায় শিরায় কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমরা দেখিতেছি কিন্তু সে শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। যে বিজ্ঞানবান্ পুরুষের ইচ্ছাতে বৃক্ষ এই জীবনী শক্তি পাইয়াছে, তিনি তো এই বৃক্ষেতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে।" "এই গূঢ় পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, সকল বস্তুতে আছেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না।" ইন্দ্রিয়-

সকল বাহিরের বস্তুই দেখে, অন্তরের বস্তুকে দেখিতে পায় না—ধিক্ ইন্দ্রিয়-সকলকে! "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্ত চক্ষুর মৃতত্বমিচ্ছন্।" স্বয়ম্ভু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন। সেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন ধীর অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া, মুদিত চক্ষু হইয়া, সর্ব্বান্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া, নিদিধ্যাসন করিয়া এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ-ভূমি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম। চর্ম্ম-চক্ষুতে নয়, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুতে। আমার প্রতি উপনিষদের উপদেশ এই—"ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং" ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন কর। আমি ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন করিলাম। "বেদাহং এতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" "আমি এই তিমিরাতীত আদিত্য-বর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

بعد ازین نور بآفاق دهم از دل خویش
که بخورشید رسیدیم غبار آخر شد

এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতুক আমি সূর্য্যেতে পঁহুছিয়াছি ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাসের শেষে আমি বসিয়া ব্রহ্মচিন্তাতে মগ্ন, এমন সময়ে এক জন সম্ভ্রান্ত লোক আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দুই হাতে দেখি সোণার বালা। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "আমি ভজ্জির রাণার মন্ত্রী, উজীর। রাণা সাহেব আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, আপনার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভজ্জি এখান হইতে অধিক দূর নয়, আর যাহাতে আপনার সেখানে যাইতে কোন কষ্ট না হয়, আমি তাহার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম এবং তথায় যাইবার দিন স্থির হইল। উজীর সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তিনি এক অশ্বে আর আমি এক ঝাঁপানে। শিমলা হইতে নীচে উপত্যকায় নামিতে লাগিলাম—এ নামা আর ফুরায় না। যতই নীচে যাই, ততই আরো নীচে যাইতে হয়। তাহার পরে যখন নদী তীরে আইলাম, তখন বুঝিলাম যে, আর নামিতে হইবে না। এই শতদ্রু নদী-তীরে রাণার রাজধানী সোহিনী নগরী শোভা পাইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা সেখানে পঁহুছিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলাম। তথাকার লোকেরা প্রথমেই আমাকে রাজগুরুর আশ্রমে লইয়া গেল। আশ্রম দ্বারে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই রাজ-গুরু সুখানন্দ নাথ আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দোতালায় আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে বসাইলেন। ইনিই আমার দীল্লির পরিচিত সুখানন্দ নাথ। ইনি ইহাঁর গুরু হরিহরানন্দ তীর্থ স্বামীর সঙ্গে রাম মোহন রায়ের বাগানে থাকিতেন। ইনি তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানী। ইহাঁর মত মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত

অদ্বৈত মত। আমি শিমলাতে আছি শুনিয়া ইনিই রাণাকে বলিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহার এই আশা ছিল যে, আমাকে লইয়া পান ভোজনে তাঁহাদের একটা মহোৎসব হইবে। পরস্পর সদ্ভাব ও সুহৃদ্ভাবের বন্ধন হইবে। তাঁহারা জানিতেন না যে, আমি মদ্যপানে বিরত এবং আমার মতে মদ্যপান ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" মদ্য কাহাকে দিবে না, মদ্য পান করিবে না, একবারে স্পর্শ করিবে না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে মদ্যপানে যোগ দিতে না পারাতে তাঁহাদের সকল আমোদ ও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন এবং আমার আহারের পৃথক্ বন্দোবস্ত করিবার জন্য কিশোরীর উপর ভার দিলেন। আমি কঠোপনিষদের যে সংস্কৃত বৃত্তি করিয়াছিলাম তাহার উপরে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আমাকে বলিলেন যে, এ সকল বৃত্তি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সম্মত হয় নাই, অতএব ইহা আমাদিগের আদরণীয় নহে। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-গ্রন্থ হিন্দিতে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আমাকে দেখাইলেন এবং তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে দিন ইহাঁর নিকট হইতে যাইবার জন্য বিদায় লইলে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে নীচে আইলেন এবং একতালার একটি ঘর দেখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, তাহার সম্মুখের দেওয়ালে একটি সুন্দর পট ঝুলিতেছে, তাহার মধ্যে "ওঁ তৎসৎ" বড় দেবনাগর স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সুখানন্দ নাথ অতি ভক্তির সহিত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি আবার বলিলেন, যেমন কলিকাতার নিকটে কালীঘাট আছে, তেমনি আমরা এই নদীতীরে একটা কালীঘাট করিয়াছি। আমি বলিলাম, আমি তাহা দেখিতে যাইতে পারিব না। পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

একটা বড় দালানে চৌকী সাজান আছে, সভাসদ্‌গণ সহ রাণা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে তাহার একটা চৌকীতে বসাইলেন এবং তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক চৌকীতে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষণেক পরে কুমার সদৃশ রাজকুমার আসিয়া সভার শোভা করিয়া বসিলেন। রাণা সাহেব আমাকে বলিলেন যে "কুমার সংস্কৃত পড়তে হৈঁ, আপ ইন্‌কা কুছ পরীক্ষা লিজিয়ে।" ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "হাম্ সব ব্যাকরণ পড় লিয়া।" বলিলাম, কহতো "গঙ্গা উদকং" ইস্‌কা সন্ধিমে ক্যা হোগা? তাড়াতাড়ি জোরে বলিল, "গঙ্গোদকং"। রাণার নিকট হইতে বাসায় আসিয়া আমি স্নানাহার করিলাম।

তাহার পর দিন প্রাতঃকালে শতদ্রু নদী-তীরে ভ্রমণে একাকী বহির্গত হইলাম। কৃষ্ণ নগরের জলঙ্গী নদীর ন্যায় এখানে শতদ্রু নদীর প্রশস্ততা—তাহার জল সমুদ্র জলের ন্যায় নীল, উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার। এখানকার শতদ্রু নদীর জলের উপমা, বাল্মীকি কবির তমসা নদীর ন্যায়—"সজ্জনানাং যথা মনঃ"। আমি চর্ম্ম-মসকের উপরে চড়িয়া এই নদীর পারেও গিয়াছিলাম। তাহার জল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নিমগ্ন থাকাতে, কাষ্ঠের নৌকা চলিতে পারে না। মসক ভিন্ন পারে যাইবার আর অন্য উপায় নাই। পার হইয়া তাহার তীরের জল মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায় উত্তপ্ত দেখিলাম। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, বর্ষাকালে যেমন নদী ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া তাহার আয়তন প্রশস্ত হইতে থাকে এবং সেই উত্তপ্ত জলের স্থান অধিকার করিতে থাকে সেই উত্তপ্ত জলও তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে তত অগ্রসর হইতে থাকে, তীরের জল যেখানে থাকে সেইখানেই তাহা উত্তপ্ত হয়। দেখিলাম যে, সেখানে অনেক পীড়িত লোক স্নান করিতে আসিয়াছে। বলে যে, এখানে স্নান করিলে অনেক প্রকার ব্যাধির উপসম হয়।

এই পর্ব্বতবাসী ভূম্যাধিকারীদিগের মধ্যে প্রধান রাজা। পরে রাণা, পরে ঠাকুর, সর্ব্বশেষে জমিদার। এখানকার জমিদারেরাই কৃষক। হিন্দুস্থানের জমিদারদিগেরও এই দশা। পর্ব্বতে রাজা ও রাণাদিগের ক্ষমতা অধিক, ইহারাই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা। রাজা ও রাণাদিগের বিবাহকালে সখীগণ সহিত কন্যার সম্প্রদান হয়। রাণীর গর্ভের পুত্র রাজা অথবা রাণা হয়। সখীর গর্ভের পুত্র রাজ পরিবারে থাকিয়া যাবজ্জীবন অন্ন পায়। সখীর গর্ভে জাত কন্যা রাজকন্যার সখী রূপে পরিচিতা থাকে এবং সেই রাজ-কন্যারই স্বামীর হস্তে তাহাদিগের জীবন ও যৌবন সমর্পণ করিতে হয়। কি অনর্থ! কি অনর্থ! রাজার এবং রাণার রাণীও অনেক, সুতরাং সখীও বিস্তর। এক স্বামীর মৃত্যু হইলে ইহারা সকলে বন্দির ন্যায় কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া যাবজ্জীবন রোদন করিতে থাকে। ইহাদিগের পরিত্রাণের আর উপায় নাই।

আমি সপ্তাহ কাল সেখানে থাকিলাম। পরে রাণা ও রাজ-গুরুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া শিমলার অভিমুখে আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথে আসিতে আসিতে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, মৃগয়াশীল রাজকুমার রত্ন-কুণ্ডল, হিরার-কণ্ঠি, মুক্তার মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্যের আভাতে তাঁহার সেই নবীন মুখ-মণ্ডল দীপ্তি পাইয়া অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহাকে আমার বোধ হইল, যেন একটি বনদেবতা। এই তাহাকে দেখিতেছি, এই সে বনের মধ্যে ডুবিয়া গেল; এই সে কাছে, এই সে দূরে, এই নীচে, এই পর্ব্বতের উপরে। তাহার পরে আমি অতি কষ্টে একটা ভাঙ্গা সঙ্কীর্ণ পথ আরোহণ কবিয়া নির্ব্বিঘ্নে শিমলাতে উপস্থিত হইলাম। শিমলার উপরের পথে দেখি যে, সেই ফাল্গুন মাসেও তথায় বরফ পড়িয়া রহিয়াছে। বৃক্ষলতা-সকল শুষ্ক ও

নীরস। বাঁশের অসার কঞ্চির মত বাতাসে তাহারা ঝন্ ঝন্ করিতেছে। চৈত্র মাসও শেষ হইল, ফুলে ফুলে সকল ভূমি একবারে মনোরম উদ্যানভূমি হইয়া উঠিল। নূতন বৎসর আবার দেখিলাম। গত বৎসর বৈশাখ মাসে প্রথম যে ঘরে উঠিয়াছিলাম, এক বৎসর সেই ঘরেই কাটিয়া গেল। এখন বাজারের ঘর ছাড়িয়া পর্ব্বতের উপরে একটি সুরম্য নির্জ্জন স্থানে একটা বাঙ্গালা লইলাম। এই স্থান আমার বড় ভাল লাগিল। সেই চূড়ার উপরে একটি মাত্র বৃক্ষ ছিল, সে আমার নির্জ্জনের বন্ধু হইল। এই বৈশাখ মাসে মধ্যাহ্ন আহারের পর মনের আনন্দে আমি সকল খালি বাড়ীর বাগানে বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। বৈশাখের দুই প্রহরের রৌদ্রে পশমের চোগা গায়ে দিয়া বেড়াইতেছি ইহার রহস্য আমার স্বদেশী বঙ্গবাসীরা কি বুঝিবেন? আমি কখন কখন কোন নির্জ্জন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ শিলাতলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া এক বেলা কাটাইতাম। এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি যে, একটা বনাকীর্ণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটা পথ চলিয়া গিয়াছে, আমি অমনি মনের সাধে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। আমি তন্মনস্ক হইয়া সেই যে চলিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার আর বিরাম নাই। পদক্ষেপের উপর পদক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহা জানি না। আমি কোথায় যাইতেছি, কতদূর এ'লাম, কতদূর যাইব, তাহার গণনা নাই। অনেক ক্ষণ পরে একটি পথিককে দেখিলাম, সে আমার বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। ইহাতে আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল— আমাতে সংজ্ঞা আইল। আমি দেখি যে, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি, বন, কানন সকলই অন্ধকারে

আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্দ্ধ চন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড় খড় করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম, আমার উপরে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়া রাত্রি ৮ টার মধ্যে বাসাতে পঁহুছিলাম। তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তখনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। এক দিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জন ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে! কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ বাণী শুনিলাম—"তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে

যে সত্য লাভ কবিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।” আমি চমকিয়া উঠিলাম! তবে কি আমাকে এই পুণ্য-ভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার কবিয়া সংসাব হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লান ভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম—ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল? বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম, কিশোরি! আমার আর শিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃদ্কম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম—ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, আমার হৃদয়ের সে ধড়্ধড়ানি আর নাই—সব ভাল হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু

ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এমনি তাঁহার হুকুম। "হুকুম অন্দর সব কোই, বাহার হুকুম না কোই।" আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি? প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে—"এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।" প্রকৃতিরা দুর্ব্বলই হউক আর সবলই হউক; আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি? তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার মনে বল আইল। এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে। কিন্তু আমি আর সে সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগ-মুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।

১লা কার্ত্তিক বিজয়া দশমী, শিমলার বাজারে সদর রাস্তায় আমার ঝাঁপান, দোলা, ও ঘোড়া সকলই প্রস্তুত। আমার চারি-দিকে আমার স্বদেশীয় বন্ধুরা অতি দুঃখের সহিত আমাকে বিদায় দিলেন। আমি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঝাঁপানে চড়িয়া প্রস্থান করিলাম। বিজয়া দশমীতে আমার শিমলা হইতে বিসর্জ্জন হইল। পাহাড়ের পথে নামিতে বড় সহজ। শীঘ্রই পর্ব্বতের পাদদেশ কাল্‌কাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে শোভাময় সূর্য্যোদয় দেখিলাম, তাহার সঙ্গে আমার মনও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাল্‌কা ছাড়াইয়া পঞ্জোরে আইলাম। এখানে একটা বাগানে বড় সমারোহ দেখিলাম। বাগানের শত শত ফোয়ারা সব খুলিয়া দিয়াছে, তাহারা আজ

শেন নব জীবন পাইয়া উল্লাসে জল উদ্গীরণ করিয়া অনবরত জলধারায় বর্ষা ঋতুর অনুকরণ করিতেছে। ফোয়ারার এমন শোভা পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখি নাই। এখান হইতে আম্বালায় আসিয়া ডাকের গাড়ি ভাড়া করিলাম এবং তাহাতে চড়িয়া দিন রাত্রি চলিতে লাগিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া রহিয়াছে, খোলা মাঠ হইতে শীতল বায়ু আসিতেছে। গাড়ি হইতে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখি যে, ঘোড়সওয়ার আমার গাড়ির পাশে পাশে ছুটিতেছে। বিদ্রোহীদিগের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগের নিরাপদের জন্য গাড়ির সঙ্গে রাত্রিতে সওয়ার ছুটিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। আমি ইহাতে পথের সঙ্কট বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার মনে মনে কিছু শঙ্কা হইল। বেলা দুই প্রহরের সময় কানপুরের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে ঘোড়া বদলাইবার জন্য আমার গাড়ি থামিল, দেখি যে, সেখানে একটা মাঠে অনেক তাম্বু পড়িয়াছে, লোকের বিস্তর ভিড় এবং সেখানে একটা বাজার বসিয়াছে। কিছু খাদ্যের জন্য কিশোরীকে পাঠাইলাম, সে সেখান হইতে আমার জন্য মহিষের দুগ্ধ আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কিসের বাজার? বলিল, দীল্লির বাদশাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই জন্য বাজার। শিমলাতে যাইবার সময়ে ইহাঁকে যমুনার চরে সুখে ঘুঁড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আজি আসিবার সময়ে ইহাঁকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দি হইয়া কারাগারে যাইতেছেন। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন্ কি ঘটে তাহা কে বলিতে পারে? শিমলা হইতে বিপদ্‌সঙ্কুল অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কানপুরে উপস্থিত হইলাম। এখন এখান হইতে রেল পথ খুলিয়াছে। শুনিলাম, প্রাতে ছয়টার সময়ে গাড়ি ছাড়িবে। আমি ভোরে উঠিয়া একটু চা পান করিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেষণে পঁহুছিলাম। সাতটা বাজিয়া গেল, কিশোরী ষ্টেষণ

হইতে আসিয়া বলিল যে, "টিকিট পাওয়া যাইবে না। আজ গাড়িতে দীল্লির ফেরত আঘাতী সৈন্যেরা যাইবে। অন্যের জন্য তাহাতে জায়গা নাই।" আমি নিজে অনুসন্ধানের জন্য ষ্টেষণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এক জন বাঙ্গালী ষ্টেষণ মাষ্টার আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আপনি ? ওরে গাড়ি থামা, থামা! আমি মনে করিয়াছিলাম আর কেউ ?" সে বলিল "আপনাকে আমি টিকিট দিতেছি এবং আমার ক্ষমতা আছে আমি গাড়ি থামাইয়া আপনাকে উঠাইয়া দিতে পারিব। আমি আপনার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পুরাতন ছাত্র। পরীক্ষায় আমাকে কতবার পুরস্কার দিয়াছেন, আমার নাম দীন নাথ।" সে আমাকে টিকিট দিল, আমি কাপ্তান সাহেবদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া কানপুর ছাড়িলাম। বেলা তিনটার সময়ে এলাহাবাদে পঁহুছিলাম। তখন তথাকার ষ্টেষণ নির্ম্মিত হয় নাই, পথের মধ্যে একটা স্থানে গাড়ি লাগিল, আমরা সেখান হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। তিন ক্রোশ দূরে এলাহাবাদের ডাক বাঙ্গালা পাইলাম, সেখানকার ঘর সব লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি সে বাঙ্গালায় আর স্থান পাইলাম না। আমার সঙ্গে একটা চৌকী ছিল, একটা বৃক্ষ-তলায় জিনিস পত্র রাখিয়া সেখানে সেই চৌকীতে আমি বসিলাম। কিশোরী ডাক বাঙ্গালা হইতে আমার জন্য এক কুঁজা জল আনিল। আমি কিশোরীকে বলিলাম যে, তুমি এলাহাবাদ সহরে যাইয়া আমার জন্য একটা বাড়ী ঠিক্ করিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও, বাড়ীতে না উঠিয়া আমি জল গ্রহণ করিব না। কিশোরী চলিয়া গেল। পরেই এক খানা গাড়ি আসিযা উপস্থিত। গলায় কাচা বান্ধা দুই জন লোক তাহা হইতে নামিয়া আমাকে বলিল, "কেল্লার নিকটেই আমাদের লাল কুঠি। যদি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া সেখানে থাকেন, তবে আমরা বড়ই কৃতার্থ হই। আমাদের

এখন পিতৃদায়।” আমি তাহাদের সঙ্গে সেই লাল কুঠিতে গেলাম। তাহাদের ঠাকুর-সেবা ছিল, আমার জন্য সেখান হইতে ডা'ল আর রুটী সন্ধ্যার সময়ে আসিল। আমার তখন অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। সে ডা'ল আর রুটী আমার বড়ই সুস্বাদু লাগিল। আমি তাহা তৃপ্তিপূর্ব্বক সব খাইয়া আরো প্রত্যাশা করিতেছিলাম, কিন্তু কেহই আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল না। আমি সে দিন ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ খাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি তাহার পর দিনে দেখিলাম যে, এলাহাবাদের রাস্তায় গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগকে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, "যিনি আরো পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতে চাহিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবনের জন্য দায়ী হইবেন না।" এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমার মন বড়ই উৎক্ষিপ্ত হইল। শুনিলাম, তখনো দানাপুরে কুমার সিংহের লড়াই চলিতেছে। মনে করিলাম, ডাঙ্গা পথে যাইতে যদি এত বিপদ, জল পথেও কি যাইবার সুবিধা নাই? এই ভাবিতে ভাবিতে আমি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চলিলাম। বেড়াইতে গিয়া দেখি যে, একটা ষ্টীমারে ধূমা উড়িতেছে, সে তখন ছাড়ে ছাড়ে। আমি দৌড়াদৌড়ি গিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। কাপ্তানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ষ্টীমার কোথায় যাইবে? সে বলিল, "একটা ষ্টীমার কিছু দূরে মাঝ গঙ্গায় চড়ায় ঠেকিয়া রহিয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য এখন এ ষ্টীমার যাইতেছে, এখানে ফিরিয়া আসিয়া তিন দিন পরে এ কলিকাতায় যাইবে।" তখন আমি তাহার একটা ঘর ভাড়া করিবার জন্য আগ্রহ জানাইলাম। সে বলিল, "রুগ্ন ও আহত সৈনিক পুরুষদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য এ ষ্টীমার গবর্ণমেণ্ট ভাড়া করিয়াছেন, পথিকদিগের জন্য ইহার ঘর মিলিবে না। তবে যদি তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ারের নিকট হইতে এক হুকুম আনিতে পার, তবে আমি তোমাকে ইহাতে লইতে পারি"। আমি তাহার এই উপদেশ অনুসারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ব্রিগেডিয়ারের কার্য্যালয়ে একটা মস্ত বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। তখন ব্রিগেডিয়ার অন্য কাজে বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমাকে পর দিন সকালে আসিতে বলিলেন। সকাল বলিতে প্রভাতে কিম্বা বেলা

দশটার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি বুঝিতে না পারিয়া আমি প্রভাতেই তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বসিয়া বসিয়া দশটা বাজিয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার আফিসেই আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাইলাম। তিনিও বলিলেন যে, "এ ষ্টীমারে সৈনিক পুরুষেরা যাইবে, তাহাদের সহিত তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার ভিন্ন ইহাতে আর কেহ স্থান পাইতে পারে না"। আমি বলিলাম, যখন গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগকে ডাঙ্গাপথে যাইতে নিষেধ করিতেছেন এবং জল পথে গবর্ণমেণ্টের লোকদের সঙ্গে নিরাপদে যাইবার আমার সুযোগ হইতেছে, তখন তুমি আমাকে যাইতে দিবে না কেন? ব্রিগেডিয়ার মনে করিয়াছিলেন যে, আমি বিদ্রোহী দলের কেহ হইব। আমার এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিমলাতে লর্ড হে প্রভৃতির সঙ্গে আমার আলাপ আছে জানাইয়া তাঁহাকে আমার সকল পরিচয় দিলাম। তখন তিনি একটা ক্যাবিন আমাকে ভাড়া দিবার জন্য ষ্টীমারের কাপ্তানকে চিঠী দিলেন। ইতিমধ্যে সেই ষ্টীমার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমি যাইয়া কাপ্তানকে ব্রিগেডিয়ারের চিঠী দিলাম। কিন্তু এখন কাপ্তান বলিলেন যে, "এ চিঠীতে কি হইবে? ষ্টীমারে ক্যাবিন তো খালি নাই, তোমাকে ক্যাবিন কি করিয়া দিব?" আমি বলিলাম, যদি ক্যাবিন নাই তো আমি ডেকেই যাইব; তুমি ক্যাবিনের ভাড়া লও, ও আমাকে ষ্টীমারের ডেকে যাইতে দাও। ষ্টীমারের সঙ্গে যে কার্গো-বোট ছিল, তাহার কাপ্তান আমাদের এই বিতণ্ডা শুনিয়া সেখানে আইল এবং বলিল, "ষ্টীমারে ক্যাবিন নাই, কিন্তু আমার বোটে আমার যে ক্যাবিন আছে তাহার ভাড়ার টাকা দিলে আমি তাহা ছাড়িয়া দিব"। আমি বলিলাম যে, "আচ্ছা আমি টাকা দিতেছি তুমি তোমার ক্যাবিন আমাকে ছাড়িয়া দাও" সে বলিল, "তুমি তোমার

জিনিস পত্র লইয়া আইস, আমি ইতিমধ্যে তোমার জন্য ক্যাবিন পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি”। তখন আমি তাহার কথাতে আহ্লাদিত হইয়া দৌড়াদৌড়ি লাল কুঠিতে গিয়া আমার সকল দ্রব্যাদি আনিলাম। আমার চির সুহৃৎ নীল কমল মিত্র আমার পথের খাওয়ার জন্য এক ঝুড়ি মিঠাই সন্দেশ দিলেন, তাহাতে আমার বড়ই উপকার হইয়াছিল। শীঘ্রই ষ্টীমার কলিকাতাভিমুখে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কাশীতে পঁহুছিয়াই একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কাপ্তান এক টেলিগ্রাফ পাইলেন যে, এ কার্গো বোটের জন্য দ্বিতীয় ষ্টীমার আসিতেছে, তাহাকে অন্য কার্গো বোট আনিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কাপ্তান এই টেলিগ্রাফ পাইয়া অস্থির হইল, সে বলিতে লাগিল, “আমি আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না, গবর্ণমেণ্টের হুকুমের কিছুই ঠিকানা নাই। এতটা পথ আসিয়া আবার আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এ বড় অন্যায়”। কাপ্তানের বাড়ী যাইবার জন্য মনে ব্যগ্রতা ছিল, এদিকে ষ্টীমার কার্গো বোটকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলে ষ্টীমারের সাহেব বিবিদিগেরও ফিরিয়া যাইতে হইবে, অতএব সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এ টেলিগ্রাফে কিছু এমন বলিতেছে না যে, এই খানেই কার্গো বোট রাখিয়া ষ্টীমার চলিয়া যাইবে। যেখানে আগন্তুক ষ্টীমারের সহিত তাহার দেখা হইবে, সেইখানে তাহাকে কার্গো বোট দিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। হয়তো তাহার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই এ ষ্টীমার কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে। সাহেবদিগের এইরূপ পরামর্শে কাপ্তান সম্মত হইয়া ষ্টীমার কলিকাতার দিকে ছাড়িলেন। আমি এই ষ্টীমারে যাইতে পথে এক সংবাদ পত্রে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথের মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। এই সংবাদে শোকাবিষ্ট হৃদয়ে অন্যমনস্ক হইয়া একটা কি দ্রব্য আনিবার জন্য ডেক হইতে ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম এবং সেই দ্রব্য

লইয়া তাড়াতাড়ি যেই ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি, আমার পা আর প্রতিষ্ঠা-ভুমি পাইল না। আমি আচম্বিতে দ্বিতীয় পা না বাড়াইয়া পৃষ্ঠের দিকে একটা ঝোঁক দিয়া ক্যাবিনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। খালাসীরা "হাঁ, হাঁ" করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া দেখে যে, আমার এক পা খোলের মধ্যে ঝুলিতেছে ও আমার সমস্ত শরীরটা ক্যাবিনের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা বলিল, "জিনিস তুলিবার জন্য এই ক্যাবিনের সম্মুখের রাস্তার পাটাসকল উঠাইয়া ফেলিয়াছিলাম, আপনি কি তাহা দেখেন নাই?" আমি তো তাহা দেখি নাই, আমি জানি যে, পূর্ব্বের মত সে রাস্তা ঠিকই আছে। আমি যদি দ্বিতীয় পা বাড়াইতাম, তবে পঞ্চাশ হাত নীচে খোলের মধ্যে পড়িয়া আমার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। সে দিনকার জন্য তো আমার প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু সংসারের ডাকাত ঘুমায় নাই, তাহা হইতে নির্ভয় হইও না—যদি আজ সে না নিয়া যায়, কা'ল সে নিয়া যাবে"।

رهزن دهر نخفت است مشو ایمن ازو
اگر امروز نبرده است که فردا ببرد

রামপুর বোয়ালিয়াতে পঁহুছিতে পঁহুছিতে দেখি যে, ধূমা উড়াইতে উড়াইতে একটা ষ্টীমার আসিতেছে। তাহা দেখিয়া কাপ্তান আমাদের ষ্টীমার থামাইলেন। আগন্তুক ষ্টীমার তাহার কাছে আসিয়া থামিল এবং সেইখানেই দুই ষ্টীমার নোঙ্গড় ফেলাইয়া রহিল। সাহেব বিবিরা এ ষ্টীমারে যাইয়া দেখিলেন যে, সে ষ্টীমার খানি ছোট, এবং তাহার ঘর সংখ্যায় অতি অল্প, ইহাতে তাঁহাদের সকলের সম্পোষ্য হইবে না। সাহেবেরা ডেকে থাকিয়াও একপ্রকারে কাটাইতে পারেন, কিন্তু বিবিরা কোথা থাকিবেন? কার্গো বোটে মিলিটারী সার্জন প্রভৃতি যে সকল সাহেবেরা ছিলেন, কাপ্তেন তাঁহাদের কাছে যাইয়া তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মিলিটারী সার্জন কিছু স্পষ্টবাদী, তিনি বলি-

লেন "এমন কতবার আমি বিবিদের সন্তোষার্থে ক্যাবিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহার জন্য একটা "থ্যাঙ্কও" পাই নাই"। কার্গো বোটের ক্যাবিনের অধিকারী সাহেবরা কেহই বিবিদের জন্য তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে কাপ্তান আমার কাছে আসিয়া নম্রভাবে অনুরোধ করিলেন, "বিবিদের থাকিবার আর স্থানের সঙ্কুলান হইতেছে না, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ক্যাবিনটা ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা বড় বাধ্য হন"। আমি অতি আহ্লাদের সহিত আমার ক্যাবিন তাঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিলাম। কাপ্তান ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ইংরাজেরা বিবিদের স্বদেশীয় হইয়াও তাঁহাদের একটু স্থান দিলেন না, আপনি কেমন উদার ভাবে তাঁহাদের জন্য আপনার ক্যাবিন ছাড়িয়া দিলেন, ইহাতে আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম"। ক্যাবিন ছাড়াতে আমার নিজের কিছু কষ্ট হইল না। যাহাতে আমি ডেকে আরামে থাকি তাহার জন্য কাপ্তানেরা সকলে মিলিয়া সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি সেই ডেকের মুক্ত বায়ুতে রাত্রিতে সুখে শয়ন করিলাম। রামপুরে ষ্টীমার বদল ও বন্দোবস্ত করিতে কিছু বিলম্ব হইবে, অতএব আমার আসিবার সংবাদ দিবার জন্য আমি কিশোরীকে একটা ডিঙ্গি করিয়া অগ্রেই বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। তাহার পর দিনই ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ আমি নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। তখন আমার বয়স ৪১ বৎসর।

কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে।
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে—কত যে তোমার করুণা।

ওঁ নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্! নমস্তেঽস্তু।

পরিশিষ্ট

প্রকাশক কর্ত্তৃক বিবৃত।

পরিশিষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্টে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবনের অনেক আখ্যায়িকার কথা উল্লেখ করিব। সে সকল আখ্যায়িকা পাঠকবর্গের পক্ষে সাতিশয় প্রীতিকর হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, মহর্ষির জীবনকাহিনী উল্লেখ করিতে হইলে, তাহার মধ্যে স্বভাবতঃই প্রকাশককেও আসিয়া পড়িতে হইবে। কারণ প্রকাশকের সহিত তাঁহার জীবনের সম্বন্ধ বহু দিনের ও বহু বিষয়ের, সুতরাং সম্পূর্ণ অনিচ্ছা স্বত্বেও প্রকাশকের সহিত মহর্ষির কিরূপে সাক্ষাৎ হইল, কিরূপে পরিচয় ঘটিল, কিরূপে সম্বন্ধ হইল ও কিরূপে সম্বন্ধ গাঢ়তর ও নিকটতর হইয়া দাঁড়াইল তদ্বিষয়ও প্রসঙ্গতঃ কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক হইতেছে—

১৮০১ সালের অগ্রহায়ণ মাস। বিন্ধ্যগিরির যে অংশের পূর্ব্বদিকে মতি নির্ঝরিণী ও পশ্চিম দিকে মুসলমান রাজত্বের বঙ্গ সীমার পশ্চিম দ্বার স্বরূপ তেলিয়াগড়ি নামক গড়, তাহার নাম লোদো পাহাড়। এই লোদো পাহাড়ের উপত্যকা ভেদ করিয়া গঙ্গা নদী পূর্ব্ব স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার দক্ষিণ তীরে পর্ব্বত কোলে যে বসতি, তাহার নাম সাহেবগঞ্জ। এই স্থানে রেলওয়ে কোম্পানীর একটি বড় ষ্টেষণ আছে। কর্ম্মোপলক্ষে আমি তথায় বাস করিতাম। ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার জন্য "হরিসভা" নাম দিয়া আমি এখানে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলাম। উপরোল্লিখিত সময়ে এখানে এক দিন জনরব উঠিল যে, "হিমালয় হইতে প্রত্যাগত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বজ্‌রা আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় তন্ত্রী যেন

বাজিয়া উঠিল এবং আমার গূঢ় প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া সেই অদৃষ্ট মহাপুরুষের পদপ্রান্তের দিকে অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইল। অবসর বুঝিয়া হৃদয়ের ঐক্য হৃদয় দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। একটি গূঢ় আত্মিক যোগ ঈশ্বরের ইচ্ছার আলোকে প্রকটিত হইল। আমি পর দিন মধ্যাহ্ন-কালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। গঙ্গা-তীরে বজরা খুজিতে খুজিতে নগর ছাড়াইলাম। দেখি যে, জন কোলাহল-শূন্য শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ছায়াময় তীরে বজরা বাঁধা রহিয়াছে। গিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। বজরার ছাতে উপবিষ্ট একটি ভৃত্য আমাকে দাঁড়া-ইতে দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল, তদনন্তর বাহিরে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

বজরার ভিতরে গিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম যে, দিব্যকান্তি সমাহিত এক যোগী সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত মনোযোগ তাঁহার ভ্রূর মধ্যগত। বহির্দৃষ্টি সম্মুখের আকাশে স্থির রহিয়াছে। মুখে শ্বেত শ্মশ্রু, মস্তকে শ্বেত কেশ, মুখশ্রী শুক্রতারার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল; তাহা হইতে ব্রহ্মবর্চ্চঃ নির্গত হইয়া সম্মুখের আকাশকে জ্যোতিষ্মান করিতেছে। আমার সংশয় হইল যে, এই পুরুষ মনুষ্য, না, কোন লোকান্তরবাসী দেবতা! তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। তখন প্রাণ ভরিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বসি-লাম। তিনি স্নেহমাখা মধুর বাক্যে আমার নাম, ধাম ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত বৈকাল তাঁহার মুখ হইতে অমৃতময়ী ধর্ম্মকথা শুনিয়া সন্ধ্যার সময়ে গৃহে ফিরিলাম। আসিবার সময়ে তাঁহার এই অনুগ্রহ যাচ্ঞা ও লাভ করিলাম যে, কল্য প্রাতে আমাদের হরি-সভায় গিয়া তিনি উপদেশ দিবেন। এই সংবাদ যখন নগর মধ্যে প্রচার করিলাম তখন সকলেরই হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কল্য যেন কি একটা পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইবে, তাই তাহারই উদ্যোগে আজ সকলে সভা সাজাইতে ব্যস্ত হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে দেখিবেন, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন, ইহাতে আমার বন্ধুরা পরম সৌভাগ্য বোধ করিলেন।

পর দিন প্রাতে আমরা অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে সভায় আনিতে গঙ্গাতীরে গেলাম। তিনি তখন উপাসনায় আছেন। উপাসনা হইলে

দুগ্ধ পান করিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিলেন। আসিবার সময়ে, কেমন করিয়া তিনি উচ্চ নীচ পর্ব্বত ও তাহার শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান তাহাই দেখাইবার জন্য বালকের ন্যায় সরল ভাবে বন্ধুর ভূমি সকলের উপর দিয়া গল্প করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন। সভা লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—গৃহে লোক, বাহিরে লোক। তিনি উপাসনার পর, পরলোক সম্বন্ধীয় যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে অনেকেই চিরদিনের জন্য লাভবান হইল, আমারও হরিসভা-ব্রতের উদ্যাপন হইল। তাঁহার উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—"গর্ভস্থ শিশু গর্ভের নিয়মে সেই গর্ভেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেখিবে, তজ্জন্য তাহার চক্ষু, শুনিবে, তজ্জন্য তাহার কর্ণ, গ্রহণ করিবে, তজ্জন্য তাহার হস্ত এবং চলিবে, তজ্জন্য তাহার পদ এই অন্ধকার গর্ভেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইরূপ মানবের আত্মা তাহার শরীরের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনতার নিয়মে ধর্ম্মে উন্নত হয়। জ্ঞান শিক্ষা কর, সংযম অভ্যাস কর, প্রেমভক্তিতে সুশোভিত হও, পরকালে উন্নত লোকে ইহারাই তোমাদের পরিচালক হইবে। মাতৃগর্ভে যে দুগ্ধ-নাড়ীদ্বারা সন্তান জীবন লাভ করে, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সেই নাড়ীই প্রথমে ছেদিত হয়। যে শরীর এখন তোমাদের আত্মাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, পরলোক গমনের উপক্রমেই সেই শরীর বিনষ্ট হইবে, অতএব তাহার জন্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না।" সভা ভঙ্গের পর আমরা তাঁহাকে বজরায় পঁহুছিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলাম। আমাকে পথ হইতে ডাকাইয়া লইলেন। সভাতে আমি তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলাম তাহা চাহিলেন এবং পুনরায় আমার নাম, ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া স্বর্গীয় স্নেহ ভরে আমাকে বলিলেন যে, "আমি বনে পর্ব্বতে বেড়াই, আমার কাছে অন্য কিছু খাদ্য নাই, কিছু খেজুর আছে তুমি খাও।" ভৃত্য একটি রূপার রেকাবে করিয়া খেজুর আনিল। আমি মহর্ষিকে বলিলাম, যদি আপনি ইহা প্রসাদ করিয়া দেন, তবে খাই। তিনি হস্তে করিয়া তাহা আমাকে দিলেন, আমি তাঁহার এই প্রসাদ খাইয়া বেলা দুই প্রহরের সময়ে গৃহে আসিলাম।

পর দিন রাত্রে তিনি এখান হইতে প্রস্থান করিবেন, আমাকে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাকিয়াছেন। প্রদোষ সময়ে তাঁহার নিকটে গেলাম। দেখি যে, বজরার ছাতে এক চৌকীতে বসিয়া

তিনি একদৃষ্টে সূর্য্যের অস্তগমন নিরীক্ষণ করিতেছেন। দূর পশ্চিম দিক্ হইতে গঙ্গার বিশাল জল-স্রোত চলিয়া আসিতেছে, তাহার পার্শ্বে এক খণ্ড পাহাড়, রক্তিম সূর্য্য তাহারই নীচে ডুবিতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের মলিন প্রভা বিবেক ও বৈরাগ্যের ভাণ্ডার। পারলৌকিক জ্ঞানামৃতের ভোক্তা মহর্ষিগণের ইহাই হিরণ্ময় ভোজন পাত্র। এতদ্দর্শনেই যোগী হৃদয়ে পরলোক জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, এতদ্দর্শনেই তাঁহাদের কৃতাকৃতের স্মরণ হয়, এতদ্দর্শনেই তাঁহাদের রসনায় অনুকূল বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়। শুনিলাম, মহর্ষি বলিতেছেন—"অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি।" অর্থাৎ—"সূর্য্য অস্ত হইয়া গেলে, চন্দ্র অস্ত হইয়া গেলে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেলে এবং বাক্য স্তব্ধ হইলে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই পুরুষের কি জ্যোতি অবশিষ্ট থাকে? আত্মজ্যোতিই অবশিষ্ট থাকে।" এই বৈদিক মুহূর্ত্তে আমি মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া বসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে; তোমার আর এখানে কর্ম্ম করা উচিত নহে, তোমার উচিত ধর্ম্ম প্রচার করা।" আমি বলিলাম, আমার উচিত ধর্ম্ম প্রচার করা, কিন্তু আমি ধর্ম্মের কিছুই জানি না, আর আমার পরিবার বর্গের প্রতিপালনের জন্য কর্ম্ম না করিলে চলে না। তখন তিনি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে, তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিব এবং তুমি এখানে যে অর্থ পাও তাহাও দিব।" এ কি করুণা! তাঁহার এই দয়ার কথা শুনিয়া আমার মন স্তম্ভিত হইল এবং চক্ষে জল আসিল, আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। একটু স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, ইনি তো বৈরাগী, গৃহ ছাড়িয়া দেশে দেশে ফেরেন, ইহাঁর সঙ্গে গেলে আমাকেও গৃহ ছাড়িয়া বৈরাগী হইতে হইবে। সংসার ও বৈরাগ্য এই দুইএর কি অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। মহর্ষি পুনরায় বলিলেন, "আমার কিন্তু এই ইচ্ছা, এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা আমাকে বল।" আমি তৎক্ষণাৎ মন হইতে সকল আলোচনা, চিন্তা দূর করিয়া এবং তাঁহার এত স্নেহ ও করুণা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিগলিত নেত্রে ও কণ্ঠাবরোধ স্বরে বলিলাম যে, অদ্য হইতে আমি আপনার শিষ্য ও দাস, আমি আপনার সহিত যাইব। তিনি আমার পৃষ্ঠে ও মস্তকে

হাত চাপড়াইয়া বলিলেন যে, "অদ্য হইতে তুমি ঈশ্বরের ছায়ায় আসিলে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তুমি আমার সঙ্গে থাক।" অতঃপর তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন, আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিন দিন পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন সাধনের জন্য শান্তিনিকেতন মহর্ষির একটি আশ্রম। বীরভূমের অন্তঃপাতী বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেষণের এক ক্রোশ দূরে ভুবনডাঙ্গা নামে একটি বহুদূর ব্যাপী অনুর্ব্বর কঙ্করময় ডাঙ্গা মাঠ আছে। সে ডাঙ্গাতে কোন বৃক্ষ হয় না। রৌদ্রক্লিষ্ট পথিকের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য বহু প্রাচীন দুইটি ছাতিম বৃক্ষ মধ্যপ্রান্তরে আছে বটে, কিন্তু তাহা ক্লিষ্ট পথিকের বধ্য-ভূমি হইয়া রহিয়াছে। ঘাতকেরা দুটি মুড়ি কিম্বা দুইটি পয়সার লোভে এই স্থানে পথিকদিগকে বধ করে। এই নির্জ্জন স্থানে তপস্যাচরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে আত্মসমাধান করিবার জন্য তিনি ১৭৮৪ শকে রায়পুরের ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে তাহার স্বত্ব গ্রহণ করেন এবং বহু অর্থ ব্যয় ও বহু যত্ন করিয়া তথায় এক ইষ্টকাশ্রম ও ফলফুলে সুশোভিত উদ্যান প্রস্তুত করেন। ধ্যান ধারণার জন্য সেই ছাতিম বৃক্ষতলে শ্বেত প্রস্তরের বেদী প্রস্তুত করেন। দেখা গিয়াছে যে, এখানকার মৃত্তিকার নীচে অনেক নরমুণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে। আশ্রম নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নর-ঘাতক দস্যুগণ আপনাদিগের পাপ কর্ম্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, পথিকেরা নির্ভয় হইয়াছে এবং তথাকার পাপভূমি পুণ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত।

প্রাতঃকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে আমি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম। উত্তর আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি, যে, ফলভারে অবনত আমলক বৃক্ষ সকল সারি সারি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বকুল বৃক্ষতলে একটি হরিণ শৃঙ্খলিত, অন্য দুইটি সুন্দর কুরঙ্গ বিচরণ করিতেছে। একটি বৃহৎকায় শুন আশ্রম দ্বারে শয়ন করিয়া দূর প্রান্তরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। ঊর্দ্ধে চক্ষু তুলিলাম, দেখি যে, সম্মুখের বারাণ্ডায় মহর্ষি এক খানি আসনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কোথাও কোন শব্দ নাই। আমি পার্শ্বস্থ গৃহে পরিচারকগণের নিকট বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। কিশোরী নাথ চট্টোপাধ্যায়কে

বলিলাম যে, আমার আগমন বার্ত্তা মহর্ষির গোচর করুন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। অতঃপর বাঁকা সিং নামক এক জন পঞ্জাবী ভৃত্য আসিয়া বলিল, যে "কর্ত্তাবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। যাইবার পথে আপনার আগমন সংবাদ আমি বলায় তিনি আমাকে বলিলেন যে, বাবুকে হাত মুখ ধুইবার জল দাও গিয়া—বাবু বেগানা নেহী, এগানা হ্যায়।" আমি আশ্বস্ত হইয়া আরো অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য মাঠে বহির্গত হইলাম। অনেক ইতস্ততঃ খুজিয়া পূর্ব্বদিকে বহুদূরে গিয়া দেখি, আরো বহুদূর হইতে শুভ্র ছত্রধারী মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়া একাকী আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম ও নিকটস্থ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন "এস গো, তোমাকে আমাদের আপনার করিয়া লই।" আশ্রমের অনতি দূরে আমলক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত একটি পৃথক মণ্ডপে তিনি আমাকে লইয়া গেলেন ও তথায় আমার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহার নিকটেই একটি সুদীর্ঘ সরোবর। এ দেশে ইহাকে বাঁধ বলে। মধ্যাহ্ন সময়ে আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মহর্ষি ডাকিতেছেন। নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিলাম। বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, বসিলাম। দেখি যে, রায়পুর নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহ একটি ক্ষুদ্র ছেতার বাজাইতে বাজাইতে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৃহের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন ও গাহিতেছেন—"অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুলো না রে তাঁয়। থাকিলে তাঁর সঙ্গে শোক তাপ দূরে যায়।" মহর্ষি সমাহিত চিত্তে বসিয়া আছেন। তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমায় শ্রীকণ্ঠ বাবুকে দেখাইয়া দিলেন।

পর দিন হইতেই মহর্ষি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্রম প্রাঙ্গনে দেওয়ালের গাত্রেই একটা আতার গাছ। এই গাছের ছায়ায় বসিয়া প্রথম শ্রুতি যাহা তিনি আমাকে স্বর সংযোগে অভ্যাস করাইয়াছিলেন তাহা এই—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকসীতি॥"

অর্থাৎ—"দুই সুন্দর পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ (শরীর) অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় উভয়ের সখা; তন্মধ্যে একটি (জীব) সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য (পরমাত্মা) নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।" মহর্ষি প্রথমেই আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোক পাঠ করাইলেন কেন? যেহেতু ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ লক্ষ্য অতি স্পষ্ট ও সুব্যক্ত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অদ্বৈত বাদীর ধর্ম্ম নহে, ইহাতে জীবে ও পরমেশ্বরে যে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ, ইহার মুক্তি যে নির্ব্বাণ নহে, তাহাই তিনি আমাকে বুঝাইলেন। আশ্রমের তরুতল ছায়ায় বসিয়া আমি যখন তাঁহার নিকট শ্রুতি পাঠ করিতাম এবং তিনি আমার সহিত একত্রে তাহার আবৃত্তি করিতেন, যখন অনতি দূরে নিজ আবাস প্রাঙ্গনের আমলক বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া একাকী আপনাপনি শ্রুতি অভ্যাস করিতাম, দক্ষিণে সরোবর, বামে প্রান্তর মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা নৃত্য করিতেছে দেখিতাম, নাতি মৃদু বায়ু অঙ্গ শীতল করিতেছে, কাছেই গুরুর আশ্রম-চূড়া দেখা যাইতেছে, তখন আমার মনে প্রথম যুগের ভাব সম্পূর্ণরূপে উদিত হইত। তখন আমি মনে করিতে পারিতাম না যে, এই ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা গর্ব্বিত, উন্নত জ্ঞানাভিমান সর্ব্বস্ব বর্ত্তমান যুগে আমার জন্ম হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন বৈদিক কালের কোন অরণ্যবাসী তপস্বীর আমি শিষ্য নহি। সাহেবগঞ্জে যখন আমি থাকিতাম, তখন দিবারাত্র কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইত, রাত্রিতেও নিদ্রা যাইতে পারিতাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, এখন প্রচুর অবসর পাইলাম, মনের সাধে দিবা ভাগে ঘুমাইয়া লইব। কিন্তু মহর্ষি আমাকে শ্রুতি অভ্যাস করাইবার পূর্ব্বেই বলিয়া দিলেন যে, বাল্যকালে তোমার উপনয়ন হইয়াছে, এখন "দিবা মা স্বাপ্সীঃ" এ কথা কি তোমার স্মরণ আছে? সাবধান, দিবাতে নিদ্রা যাইও না।" মহর্ষির এই অনুশাসনে আমার মনে ভয় প্রবেশ করিল। অতঃপর দিবাভাগে যখনই চক্ষে নিদ্রা আসিত, তখনই ঐ কথা স্মরণ হইয়া নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত ও আমার বুক ধড়্ ধড়্ করিত।

শীঘ্রই শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে বাস করেন। এই স্থানে তিনি আমাকে উপনিষৎ ও কিছু কিছু ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন এবং "শাস্ত্রী" এই উপাধি দিয়া ছান্দোগ্য উপনিষৎ অনুবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে অনুমতি করেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ছাঁটিয়া উপনিষদের টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ আহ্লাদের সহিত তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিতে লাগিলাম কিন্তু নিজেকে অযোগ্য বোধে এই উপাধি গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তথাপি গুরুদেবের নিতান্ত ইচ্ছা ও আদেশে বাধিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলাম এবং তাহা আমার বিদ্যার সম্মান মনে না করিয়া আমার কুলের প্রাচীন উপাধির স্থানে গ্রহণ করিয়া বংশানুক্রমে গুরুর এই প্রসাদ উপভোগ করিতে মনস্থ করিলাম।

গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল। মহর্ষি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। এখানে অবস্থান কালে প্রত্যহ প্রাতে উপাসনান্তে দুগ্ধ পান করিয়া লোহার ফলা লাগান একটা মোটা বেতের যষ্টি হস্তে করিয়া পর্ব্বত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং পর্ব্বতের শিখর কন্দর সমস্ত ভ্রমণ করিয়া বৃক্ষ, লতা, ফুল পত্রের সহিত কত কি আলাপ করিয়া আনন্দ মনে গৃহে ফিরিতেন। গৃহে আসিয়া আমাকে পারস্যগ্রন্থ দেওয়ান-হাফেজ পড়াইতেন। আহারান্তে কঠাদি উপনিষৎ পড়াইতেন। উপনিষদের অর্থ এবং গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব এরূপ বিশদরূপে বুঝাইতেন যে, তাহাতে আমার মন অতিশয় নিবিষ্ট হইয়া যাইত। আমি যে দিকে মুখ করিয়া পড়িতে বসিতাম, পাঠান্তে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে পারিতাম না।

অন্ধ দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে মহর্ষির পিতা এক লক্ষ টাকা দানের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ টাকার সুদ মহর্ষি বৎসরে বৎসরে দাতব্য ভাণ্ডারে দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনান্তে অথবা কোনরূপ বৈষয়িক দৈবোৎপাতে এই দান পাছে রহিত হইয়া পড়ে এই ভয় তাঁহার মনে সর্ব্বদা হইত। তিনি ক্রমশঃ নিজের ব্যয়ের টাকা হইতে বাঁচাইয়া লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন ও তাহা এই স্থান হইতে গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রদান করিয়া আপনাকে ও আপনার বংশকে অঋণী করেন। এখানে সমস্ত গ্রীষ্মকাল কাটিল। অতঃপর মহর্ষি এই

পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া মসুরী পর্ব্বতের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দামুক-দেয়াড় নামক স্থানে পদ্মাতে বজরায় আরোহণ করিয়া কাণপুরে গিয়া কিছু দিন বিশ্রাম করেন। পথে মুঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের নিতান্ত অনুরোধে তথায় এক সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। জলপথে ভ্রমণের সময় তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, প্রতিদিন প্রাতে উপাসনান্তে দুগ্ধ পান করিয়া তিনি নদীর তীরে তীরে হাঁটিয়া যাইতেন এবং অনেক পর্য্যটনের পর বজরায় উঠিতেন। ভোজপুরের মধ্যে এক দিন তিনি এইরূপে বজরা হইতে নামিয়া গিয়াছেন, অনেক দূর শূন্য বজরা লইয়া গিয়া একটা পথের ধারে গঙ্গার ঘাটে আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মহর্ষির ফিরিয়া আসিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি ফিরিলেন না। মনে ভাবনা হইল—তখন তাঁহার উদ্দেশে একজন চাকর পাঠাইলাম। সেও ফিরিল না—অবশেষে আমি বজরা হইতে নামিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তীরে উঠিয়া চারি দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কোথাও জনমানবের গন্ধও নাই। দূরে একখানি গ্রামের গাছপালা ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে, আর সেখান হইতে এ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে বামে গোধূম ও যব ক্ষেত্রের এক পারাবার। আমি সেই গোধূম ক্ষেত্রের মধ্যে একটি পথ দিয়া গ্রাম লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। অর্দ্ধ ক্রোশ গিয়াছি, তখন দেখি যে, প্রায় ১২।১৩ জন ভোজপুরে এক এক সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি, এক এক গাছা দড়া ও এক এক খানা কাস্তিয়া হস্তে লইয়া মহর্ষিকে ঘিরিয়া এইদিকে আসিতেছে। মহর্ষি অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"কাহেরে মন চিত বে উদম যা আহার হরজু পরেয়া। শৈল পাথর মে জন্ত্ উপায়ে তাকা রেজক আগে কর ধরেয়া— মেরে মাধো জী। সৎ সঙ্গৎ মিলে সো তরেয়া। গুরু পরসাদ পরম পদ পাইয়া শুকে কাষঠ হরেয়া। জননী পিতা লোক সুত বনিতা কোহি ন কিসিকো ধরেয়া। শর শর রেজক সম্বাহে ঠাকুর কাহে রে মন ভও করেয়া। উড় উড় আবে শও কোশা তিস্ পাছে বছরে ছোড়য়া। কৌন্ খেলাবে, কৌন্ চুগাবে মনমে সিমরণ করেয়া। সব নিধান দশ অট সিধান্ত ঠাকুর করতল ধরেয়া।"

"বে হরিজীউ কোই কো ভুলতে নহী। যব সব আদমি সো যাতে হ্যায় তব হরিজী একেলা জগ্ রহ্তে হ্যায়, ঔর জিস্কা যো কুছ চাহিয়ে সব

নির্ম্মাণ কর্‌কে রাখ্‌তে হ্যাঁয়। এহি দেখো, ইহাঁ পর লক্ষ্মীজীকা কৈসা প্রভাব। বে লক্ষ্মী উন্‌হীকা কৃপাসে। উনকো ভুল্‌না ঔর মর যানা বরাবর হ্যায়। যো সব প্রাণীয়োঁকো অন্ দিয়া, সবকো জ্ঞান দিয়া উন্‌কো ভুলোগে ?"

আমি নিকটে পঁহুছিলাম। দেখি যে, বেলা দুই প্রহরের রৌদ্রে তাঁহার মুখ জবা পুষ্পের ন্যায় রক্ত বর্ণ হইয়াছে। কপাল দিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। আমি যখন সঙ্গ লইলাম তখন সেই ভোজপুরেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু ইএ বাবাজী কৌন্ পাহাড়সে আয়া হ্যায় ?" আমি বলিলাম, "হিমালয় পাহাড়সে।" তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা বাবাজীকে কোথায় ধরিলে ?" বলিল যে, "আমাদের গ্রামের একটা বাগানে একটা পড়ো শুকনা আমের গাছের গুঁড়িতে ছায়ায় বসে চক্ষু বুঁজে ভজন গাহিতেছিলেন। তাহা শুনিতে পাইয়া গ্রামের লোকেরা বাবাজীকে দেখিতে একত্র হইয়াছিল। বাবাজী যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন এত লোক দেখিয়া এই গঙ্গার দিকে চলিয়া এলেন। লোকেরা সব একে একে ফিরিয়া গিয়াছে।" লোকদের সঙ্গে এইরূপে কথা কহিতে কহিতে আমরা গঙ্গাতীরে পঁহুছিলাম। তখন তাহারা মহর্ষিকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া "বাবা হমকো আশীষ দিজিয়ে, হমকো আশীষ দিজিয়ে" বলিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া আপন আপন গরু মহিষের জন্য ঘাস কাটিতে ইতস্ততঃ চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮০২ শকের প্রারম্ভে মহর্ষি মসুরী পর্ব্বতে আরোহণ করেন। কেদার নারায়ণ পর্ব্বতের ধবল চূড়া যাহার পূর্ব্বোত্তর দিকে আকাশের চক্ষুর ন্যায় ফুটিয়া আছে, যাহার পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বে শ্যামল শিখর শ্রেণী গগন ভেদ করিয়া তির্য্যক্ ভাবে অহঙ্কারে দণ্ডায়মান এবং যাহার অতলস্পর্শ নিম্নকন্দরে নদী, নির্ঝরিণী অদৃষ্ট, সেই পর্ব্বত শিখরে এক খানি গৃহ। তাহার নাম প্রায়রী। ইহার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে একটি দেবদারু বৃক্ষ। অতি নির্জ্জন, তাপস মনোরঞ্জন আশ্রমের উপযুক্তই এই স্থান। এই মানোনুকূল স্থানে তিনি ব্রহ্মে আত্মার সমাধান করিয়া চারি বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

গভীর সমুদ্রের জলরাশি যেমন বায়ু সহবাসজনিত অহরহ হিল্লোলিত হইলেও তাহার আভ্যন্তরিক ভাব অতি স্থির, গম্ভীর; সেইরূপ সমাহিত যোগী পুরুষের আত্মা ব্রহ্ম প্রেমে সর্ব্বদা আনন্দোচ্ছ্বাসিত থাকিলেও তাঁহার ব্রহ্মযোগযুক্ত প্রকৃতি সতত স্থির, সতত গম্ভীর। একই জলরাশির দুই প্রকার সৌন্দর্য্য; মত্ত সৌন্দর্য্য ও স্থির সৌন্দর্য্য। আত্মারও দুই প্রকার আনন্দ, মত্ত আনন্দ ও স্থির আনন্দ। মহিমা দর্শনে হৃদয়ে যে প্রেমের তরঙ্গ উঠে, তাহাতে যোগী মত্ত আনন্দ উপভোগ করেন। আর নিত্য ব্রহ্মসংস্পর্শ দ্বারা আত্মার অন্তরে যে জ্ঞান-যোগ অভিপ্রকাশিত থাকে, তাহা দ্বারা যোগী স্থির-আনন্দ উপভোগ করেন। একই সময়ে একাধারে উভয় আনন্দের সম্ভোগ। বিষয়-মোহে মূঢ় ব্যক্তি ইহার তথ্য কি প্রকারে জানিবে? ইহার তথ্য জানেন তাঁহারাই, যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ মহর্ষি, যাঁহারা ব্রহ্মযোগ-যুক্ত-আত্মা।

মদীয় আচার্য্য গুরু মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা। দিবারাত্র তাঁহার এ যোগের বিচ্ছেদ নাই। জাগরণে, নিদ্রায়; ভ্রমণে, উপবেশনে; ভোজনে এবং কথনে তিনি ব্রহ্মে সমাহিত। তাঁহার সমাধানের ভূমি অকাল, অনাকাশ। সকাল ও সাকাশ ভূমিতে যে তিনি ব্রহ্ম দর্শন করিতেন, সে দর্শনে তরঙ্গ উঠিত। অনন্তগুণাবলম্বী পরমেশ্বরের অনন্ত কীর্ত্তি

উপলব্ধি করিয়া যখন যে ভাব তাঁহার মনে উঠিত, তিনি তখন তাহা গানের দ্বারা, শ্রুতির দ্বারা, হাফেজের দ্বারা বা ভাষার দ্বারা বাহিরে ব্যক্ত করিতেন, এবং আমাকে নিকটে ডাকিয়া তাহা শুনাইতেন। তিনি নিশিথ সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয্যাতে বসিয়া আরাধনা করিতেন। নিদ্রিত আছি, তাঁহার কণ্ঠবিনিঃসৃত হাফেজের সময়োচিত ও ভাবোচিত বএদ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত। মহর্ষি ঐ যে জাগিতেন, আর শয়ন করিতেন না। ভোরে এরূপ স্থানে যাইয়া বাহিরে বসিতেন, যেখান হইতে সূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করা যায়। কি প্রকারে উষার শুভ্র আলোক ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আগমন করিল, কি প্রকারে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে রক্তিমবর্ণে সূর্য্য পৃথিবীর বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশে দেখা দিল, ইহা দেখিবার জন্য প্রতি দিন তিনি অপেক্ষা করিতেন। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে বস্ত্র মুড়ি দিয়া বসিয়া চুপে চুপে সেই প্রাতঃসূর্য্য হইতে অমৃত আহরণ করিতেন। বলিতেন—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥"

তদনন্তর দৈনিক উপাসনা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপাসনা প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিতেন। এ সময়ে গায়ত্রী মন্ত্র অনেক বার সাধন করিতেন। অন্তে এই গান করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন।

"তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে
নয়ন তাঁরে আগে দেখিও।"

দুগ্ধ পান করিয়া প্রকৃতির মনোহর নির্জ্জন উদ্যানের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। শরীর ও মন উভয়েরই স্বাস্থ্য বিধান ইহার লক্ষ্য। বেড়াইয়া আসিয়া প্রাঙ্গনস্থ তাঁহার প্রিয় দেবদারু তলে মন্দ সমীরণে বসিয়া ভাবনা করিতেন। দুই প্রহরের সময়ে স্নান ও অতি অল্পই আহার করিয়া নির্ব্বাচিত অন্য একটি স্থানে বসিতেন এবং সেইখানে একাসনে শয়নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতেন। একাসনে চুপ করিয়া একেলা এত দীর্ঘকাল বসিয়া থাকা অন্যের সাধ্যাতীত। তুমি কি মনে কর, মহর্ষি মনুষ্যসমাগমশূন্য হইয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি একেলা থাকিতেন? না। তিনি সতত

তাঁহারই সঙ্গে থাকিতেন, যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন, শব্দ নাই অথচ বলেন। অথবা তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি কি নিদ্রিত থাকিতেন? না। তিনি অত্যন্ত জাগ্রত থাকিতেন। এই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত ব্রহ্ম দর্শন করিতেন; সত্যের সিদ্ধান্ত করিতেন।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

কিম্বা

"তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমংপদং।"

তিনি শরীরের অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া বিষ্ণুর সেই পরম জ্যোতিষ্মান্ পদে আপনার জ্ঞানেন্ধন প্রদান করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে যখন সত্যের কোন অত্যন্ত আনন্দকর ভাবে মোহিত হইতেন, তখন শ্রুতি-মুখে বা হাফেজ-মুখে তাহা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তাহা আমি দূর হইতে শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতাম।

পঞ্জাবের এখনকার দেবসমাজের সংস্থাপক শ্রীমৎ সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী মহর্ষির সহবাস আকাঙ্ক্ষা করিয়া কিছু দিন এই স্থানে তাঁহার আশ্রমে ছিলেন। তিনি মহর্ষির নিকট অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার চরিত্রের নিগূঢ় ভাব সমূহ লক্ষ্য করিয়া নিজকৃত ধর্ম্মজীবন পত্রিকায় যে এক "স্বর্গীয় দৃশ্য" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধার করিলাম। * * * "হে দ্রষ্টা! যদি তুমি সেই স্বর্গীয় দৃশ্যকে দেখিতে চাও, তবে এস, চল, ঐ গুহার মধ্যে সমাধিযুক্ত যে তাপস বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কিন্তু কি দেখিবে? শরীরে দুই এক খণ্ড গৈরিক বসন ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। হাঁ, মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর বটে! আর উহার উপর যে প্রেমের জ্যোতি ও পবিত্রতার জ্যোতি এবং আনন্দের ভাব চমকিত হইতেছে তাহা আপনার পবিত্রতা এবং আনন্দেতে ঐ সম্মুখের ফুলকেও পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু ইহা সেই স্বর্গীয় দৃশ্যের দ্বার মাত্র। ইহা স্থূল দ্রষ্টাও দেখিতে পায়। কিন্তু সেই স্বর্গীয় দৃশ্য এখনো অনেক দূরে রহিয়াছে। চল, ভিতরে প্রবেশ কর এবং অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা নিরীক্ষণ কর। কহতো, এক্ষণে কি দেখিতেছ? ইহাই

আধ্যাত্মিক দৃশ্য! ইহাই স্বর্গীয় দৃশ্য! আহা কি মনোহর! তুমি যে বলিতেছিলে, হৃদয় মন স্থির হয় না। এখানে দেখ, এখানে দেখ, হৃদয় মন কেমন স্থির, কেমন অচল! চক্ষুর তারা ফিরিতেছে না। চক্ষুর পলক পড়িতেছে না। দেখ, ঐ যোগী শরীর মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মন সেই প্রাণারামের নিকট। দেখ, আত্মা কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে চাতকের ন্যায় কেমন প্রেমের সহিত সেই আত্মার আত্মাকে অবলোকন করিতেছে। কেমন এক সূত্রে উভয়ে আবদ্ধ। কেমন পবিত্রতা ও প্রেমের জ্যোৎস্না বর্ষিত হইতেছে। অন্তরে অন্তরে কেমন প্রেম প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, ইহাই পবিত্র প্রেম, ইহাই পবিত্র আনন্দ। এ সকলই শুভ ভাব। ইহার সমান জগতে আর কিছুই নাই। এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কেবল আধ্যাত্মিক যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" * * *

মসূরী পর্ব্বত যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোহর, তেমনি স্বাস্থ্যকর স্থান। অনেক বিজ্ঞ প্রাচীন ইংরাজ এখানে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহর্ষিকে অতি শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (Surveyor General) শ্বেত কেশ সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ বিদ্বান্ জেনারেল ওয়াকার (Gl. Walker) নামক সাহেব পূর্ব্বে অনুমতি লইয়া মহর্ষির সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে আইসেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে এত তৃপ্তি লাভ করেন যে, পর দিন বাড়ী হইতে মহর্ষিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে "পূজনীয় পিতা," (Revered Father) এইরূপ পাঠ লেখেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধ্রুবতারা যেমন নিশ্চল, যেমন স্থির, দিগ্দর্শনের শলাকা যেমন অনুক্ষণ উত্তর দিক্‌কেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, মহর্ষি সেইরূপই আপনার ধর্ম্মে ও বিশ্বাসে অটল, স্থির। তিনি রোগে, সুস্থতায়, সম্পদে, বিপদে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, শিষ্য বা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে কখন কিছুমাত্র আপনার জ্ঞান ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন না করিয়া সেই একই লক্ষ্যের দিকে অনিমেষ-লোচন থাকিয়া সমস্ত জীবন যাপন করিলেন। একটি মতের পরিবর্ত্তন নাই, একটি ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া নিজের জীবন ও ধর্ম্মকে তিনি যুগে যুগে একই বেশে রক্ষা করিয়াছেন। স্বীয় ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করা বা অন্যকে তদনুরূপ করিতে দেখিলে তাহাতে অনুমোদন করা অপেক্ষা তিনি আপনার নিধন শ্রেয়ঃ মনে করিতেন।

আমি এই স্থানে মহর্ষিদেবের লিখিত কতকগুলি পত্রের কোন কোন অংশ প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামাদি থাকিবে না। ইহা দ্বারা তাঁহার মতের দৃঢ়তা, ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগ, অসত্যের প্রতিরোধশক্তি, লোকশিক্ষা-প্রণালী; সর্ব্বকর্ম্মে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তাঁহার মহা নিয়ন্তৃত্ব-শক্তি পরিদৃষ্ট হইবে।

১

* * * "তুমি যে একটি Devine Principle খাড়া করিয়াছ এবং তাহার যে লক্ষণ দিয়াছ, তাহা একটি অন্ধ-শক্তি বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইতেছে। তোমার Devine Principleএর আত্মজ্ঞান নাই, বাহ্যজ্ঞান নাই, ইচ্ছা নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, ন্যায় নাই, প্রেম নাই। তাহাকে লইয়া আমাদের কি কাজ? তুমি যদি Devine Providence শীর্ষক দিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কর, তবে আমার এই মুমূর্ষু সময়ে মনে বড়ই তৃপ্তি হয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যিনি ব্রহ্ম, তিনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানিতে-ছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ। তাঁহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া

তাঁহার সৃষ্ট জগৎসংসার যথানিয়মে চলিতেছে, তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের শাস্তা, মুক্তিদাতা, মহান্ প্রভু, পরম পুরুষ, তিনি আত্মার আত্মা, হৃদয়ের স্বামী, তিনি ব্রাহ্মদিগের উপাস্য দেবতা। বেদ বেদান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করা আদি ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য।

Our God is not an abstract God, but an intelligent free person who consequently has a conciousness of himself.

ইনি আমাদের বন্ধু, ইনি আমাদের পিতা, ইনি আমাদের বিধাতা, ইনি আমাদের উপাস্য পরম দেবতা। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের প্রথম প্রকরণের দ্বাদশ ব্যাখ্যান "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" শীর্ষক উপদেশ পাঠ করিতে তোমাকে আমি অনুরোধ করিতেছি। যদি জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে কেবল বস্তু মাত্র বল, তবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব শব্দে abstract entity বুঝায়। এ প্রকার abstract entity সৎ নয়, অসৎও নয়, কেবল শূন্য ideal মাত্র। Real ঈশ্বরের অস্তিত্ব বলিতে গেলে, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে পুরুষ শব্দে বুঝায়, ইহাঁকেই আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।" ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ৫৩।

মসূরী।

২

আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিবে, এই প্রত্যাশায় আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, তুমি বৈদান্তিক মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া মস্তিষ্ককে আলোড়ন করিতেছ। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে তিনটি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রথম বিঘ্ন পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় বিঘ্ন খৃষ্টধর্ম্ম, তৃতীয় বিঘ্ন বৈদান্তিক মত। আমাদের সমাজের তেমন ধন বল নাই, বিদ্যাবল নাই, লোক বল নাই যে, তাহার সাহায্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত সুন্দর রূপে পুষ্ট হইতে পারে। অতি কৃচ্ছ্রে একটি ইংরাজী কাগজে ব্রাহ্ম সমাজ স্বকীয় মত প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তাহাতে যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বৈদান্তিক মতেরই চর্চ্চা ও পোষণ হইতে লাগিল, তবে আদিব্রাহ্মসমাজের আর প্রাণ থাকে না।... ঐ সংখ্যার পত্রিকাতে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবে যে, আদি সমাজের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই— তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ।...পৌষ-

লিকেরা যেমন ব্রহ্মেতে মনুষ্যত্ব আরোপ করে, বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে. যেমন তুমি পঞ্চদশী হইতে দেখাইয়াছ, "সর্ব্ব-বাধে ন কিঞ্চিচ্ছেৎ যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ।" তুমি ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছ, যে, " when all are removed " nothing remains" that nothing is that (Brahma)। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের যিনি ব্রহ্ম, তিনি "সর্ব্বে-ন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং।" তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণকে প্রকাশ করেন, কিন্তু স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত। তিনি "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।" সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় সকলের সুহৃৎ। ইহাতে পৌত্তলিকতাও নাই, শূন্যতাও নাই, ইনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্রহ্ম, ইনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। তাঁহার হাত নাই, সকল গ্রহণ করেন; তাঁহার পা নাই, সর্ব্বত্র চলেন; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, সকলই দেখেন; তাঁহার কর্ণ নাই, সকলই শুনেন; তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। ইহাঁকে ব্রহ্মজ্ঞেরা শ্রেষ্ঠ ও মহান্ পুরুষ বলিয়া বলেন। তিনি আমাদের বন্ধু ও পিতা এবং বিধাতা, "স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" শুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ মহান্ পুরুষই পরমাত্মা। তিনি জীবাত্মাকে পরিমিত রূপে জ্ঞান, প্রেম, কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন, এই জন্যই জীবাত্মা পুরুষ। পুরুষে পুরুষে যে সম্বন্ধ, পিতা পুত্রে যে সম্বন্ধ, জীবাত্মা পরমাত্মাতে সেই সম্বন্ধ।

" The first notion that we have of God, to wit, the notion of an infinite Being, is itself given to us independently of all experience. It is the conciousness of ourselves, as being at once and as being limitted that elevates us directly to the conception of Being who is the principle of our being, and is himself without bounds."—Cousin. তোমার " Devine Providence" প্রবন্ধের রচনাতে পারিপাট্য, পাণ্ডিত্য সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহা নির্দ্দোষও হইয়াছে। ইহাতে আমি আহ্লাদিত হইলাম। তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে। ঈশ্বর তোমাকে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বল প্রেরণ করুন, এই আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।"

৩রা আষাঢ়, ৫৩।

৩

"তুমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে যে, অচিন্ত্য মনে কর না, তাহা আমি জানি, কিন্তু তুমি ঈশ্বরস্বরূপ বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলে, তাহাতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে অচিন্ত্য বলা হইয়াছিল। এমন কি, তাহাতে বলিয়াছিলে যে, "শব্দের অভাবে আমরা তাহা জ্ঞান, শক্তি, করুণা শব্দে ব্যক্ত করি।" জ্ঞান শব্দের অর্থে আমরা যাহা গ্রহণ করি, তাহা তাঁহাতে নাই অর্থাৎ জ্ঞানই নাই, ইহাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের শক্তিকে শক্তি শব্দ বলিয়া যাহা বলিতেছি, সে শক্তি তাঁহার নয়, তবে তাঁহার কি শক্তি? শক্তি শব্দের অর্থে যে একটি অকাট্য বীর্য্যের ভাব বুঝায়, তাহা যেমন সৃষ্ট বস্তুতে প্রয়োগ হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তেমনি সর্ব্বস্রষ্টাতেও তাহা প্রয়োগ হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা তাহাই বুঝি। "শব্দের অভাবে আমরা তাহা জ্ঞান, শক্তি, করুণা শব্দে ব্যক্ত করি," ইহা হইতে অজ্ঞতাবাদীরা আর অধিক কি বলিতে পারে? ইহারই জন্য আমি তোমাকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি আমরা যদি শব্দের অভাবে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি আছে বলি, তবে জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মের নামও মুখে আনা উচিৎ হয় না।"

"তুমি এই পত্রে লিখিয়াছ যে, "ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণা আমাদের অপেক্ষা কেবল অধিক নহে, প্রকারে ভিন্ন।" ইহাতে এই বলা হয় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থ। এক দিকে যেমন জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর পৃথক্, তেমনি আর এক দিকে পিতা পুত্রের ন্যায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। উভয় পরস্পরের সখা, যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েতেই জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব আছে। কিন্তু সেই উভয় জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাবের ভিন্নতা এই জন্য যে, ঈশ্বরের যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব, তাহা অকৃত, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত নহে। জীবাত্মার যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব, তাহা তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে। ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ প্রকাশ করা আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য। আমরা পরস্পর সহযোগী। আমার ভ্রান্তি হইলে, তুমিও তাহা সংশোধন করিতে পার এবং তোমার ভ্রান্তি আমার বোধ হইলে, তাহাও সংশোধন করিবার আমার অধিকার আছে, ইহাতে ভয় কি? পত্রিকাতে

প্রবন্ধ লিখিতে ভীত হইবে না, যেমন পূর্ব্বে তেমনই এখনও তাহা অকুতোভয়ে লিখিতে থাক, কিন্তু ইহাতে সাবধানতারও আবশ্যক। আমার শরীরের সংবাদ আর কি দিব? দিন দিন আমার শরীরের গ্রন্থি সকল শিথিল হইতেছে, অমৃত ধাম হইতে মধুর আহ্বান আমাকে বার বার ত্বরা করিতেছে, আমি সে আহ্বানে বধির নহি। ইতি। ১৮ই আশ্বিন, ৫৩ ব্রাঃ সং।”

মসূরী।

৪

* * * “যে পর্য্যন্ত সেই পরম পুরুষের জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা, তাঁহার নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব উপলব্ধি না করি, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বর রূপে দেখি না। তাঁহাকে জীবন্তরূপে দেখাই আমাদের কার্য্য, তাহাতেই আমাদের সকল যত্ন, সকল চেষ্টা, সকল অধ্যবসায় নিঃশেষ করিতে হইবে। নতুবা তিনি আপনাকে জানেন না, এই সৃষ্টি তাঁহার ইচ্ছাতে হইতেছে না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে গেলে ব্রাহ্ম-দিগকে মতিচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের সদ্গতিতে কণ্টক দেওয়া হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম অবিকৃত, আমাদের জ্ঞান ও প্রেম কৃত। সেই অবিকৃত জ্ঞান প্রেমে পূর্ণ পরমাত্মা আমাদের আদর্শ, আমরা অনন্ত উন্নতিশীল জীব। তাঁর সেই জ্ঞান প্রেমের আদর্শ না করিয়া আমরা কি প্রকারে জ্ঞান প্রেমে চির উন্নত হইব? সেই পূর্ণ অবিকৃত গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এই সৃষ্টির অতীত আদর্শ আর কোথায় পাইব? তিনি সৎও নন, অসৎও নন, এইরূপ শূন্য বর্ণনা হইতে তাঁহার হীন বর্ণনা ভাল, যেমন নাস্তিক হইতে পৌত্তলিক ভাল।” * * *

৫

“——হউন, আর যিনিই হউন, তাহাদের প্রতি আমার এই অকাট্য কথা যে, নয় ঈশ্বরের সংসর্গ ছাড়, নয় নাস্তিকের সংসর্গ ছাড়—ইহার আর মধ্যপথ নাই। তবে আমার এই বাক্য অনুসারে চলা বা না চলা তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার উপরে নির্ভর। তুমি আর অধীর হইও না—আমাকে ক্ষমা কর। ইতি”।

৬

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা। এমন প্রিয় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বেড়া ভেঙ্গে দিলে যদি ঐ ধর্ম্মের উপকার হয়, ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে পৌত্তলিকদের ধর্ম্মের সঙ্গে সমান আসন দিলে যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চতা রক্ষা হয়, যদি নাস্তিকদিগকেও আদর দিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের গৌরব ও পবিত্রতা থাকে, তবে ব্রাহ্ম সমাজের——ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া পত্রিকার মুখ উজ্জ্বল করিবেন।"

গৃহ সংস্কার সম্বন্ধে মহর্ষির কি প্রকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পরিচালন শক্তি ছিল, তাহা নিম্নলিখিত দুই খানি পত্র পাঠ করিলে উপলব্ধি হইবে।——

৭

"* * *——র বিবাহক্রিয়া যাহার যাহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে, সে বিষয়ে——কে এক পত্র লিখিয়াছি; তাহার প্রতিলিপি পাঠ করিয়া আপনি জানিতে পারিবেন। সেই প্রতিলিপি এই পত্র মধ্যে পাঠাইতেছি।—— আচার্য্য ও পুরোহিত উভয়েরই কার্য্য সমাধা করিবেন, তাহা হইলে * * ব্রাহ্মেরাও বিবাহে আসিয়া যোগ দিতে পারিবেন। অবস্থা ও সময়ের গতিকে চলিয়াও যাহাতে ধর্ম্মের হানি না হয়, তাহাতে সাবধান হইতে হইবে। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, বিবাহের পূর্ব্ব দিনে আমাদের দালানে,——কে লইয়া পদ্ধতির বিধান মত তাঁহার যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিবেন। তথায় দুইটি পিড়ি ও আসন আনাইয়া তাহার উপরে পুরোহিতকে ও বরকে যেথানে যেমন বসিতে হইবে তাহা——রায়কেও দেখাইয়া দিবেন। তিনি বর কন্যার বসিবার ধারা ও পরিবর্ত্তন আপনার উপদেশ মত মনে ধারণ করিয়া রাখিবেন। এবং বিবাহের সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।——রায়কে বলিয়া দিবেন যে স্ত্রী-আচারের সময়ে তিনি অন্তঃপুরে থাকিয়া দেখিবেন, যেন সেখানে গ্রন্থি বন্ধন না হয়। তিনি আরো দেখিবেন যে,——ও——অথবা ইহাদের দুই জনের মধ্যে এক জন স্ত্রী আচারের পর যেন বর কন্যাকে সঙ্গে করিয়া দালানে লইয়া আইসে এবং গ্রন্থি বন্ধন পর্য্যন্ত কন্যার নিকট বসিয়া থাকে, যেহেতু ইহাদের দ্বারা গ্রন্থিবন্ধন হইবে——তাহাতে সাহায্য করিবেন।

ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া সমুদায় বিবাহ পদ্ধতি—"অমুক, অমুকী" "স্বামী-গোত্র" মাস, পক্ষ, তিথি, গোত্র, প্রবর, নাম প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট কাগজে, ৩।৪ খানা ছাপাইবেন। তাহার একখানা——র হস্তে থাকিবে, আর এক খানা——র হস্তে থাকিবে। তিনি তাঁহার নিকট বসিয়া দেখিতে থাকিবেন, যদি——র কোন ভুল হয়, তিনি শুদ্ধ করিয়া দিবেন। আর এক খানা আমার নিকটে বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পাঠাইয়া দিতে যত্ন করিবেন,——বা——কলিকাতায় পঁহুছিলেই তাঁহার নিকট হইতে তাঁহাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নাম ও গোত্র প্রভৃতি জানিয়া লইবেন।"

উপরোল্লিখিত প্রতিলিপি পত্র।

——র বিবাহের লগ্ন ৫ মাঘ সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময় ধার্য্য করিলাম, তোমার প্রতি ভার দিলাম, তুমি প্রণিধানপূর্ব্বক যথাবিধি এই শুভ বিবাহ সম্পাদন করিবে। তুমি আচার্য্য ও পুরোহিতের উভয় কার্য্য সমাধা করিবে। তুমি প্রথমে সম্প্রদাতা ও জামাতার নিকটবর্ত্তী আসন লইয়া মন্ত্র পড়াইয়া সম্প্রদাতার দ্বারা জামাতাকে যথাবিধি বরণ করাইবে। স্ত্রী-আচারের পর বর-কন্যা সম্প্রদান শালায় বিবাহ সভাতে উপস্থিত হইলে তুমি——ও——কে সঙ্গে হইয়া বেদীতে আরোহণ করিবে এবং উভয়কে তোমার উভয় পার্শ্বে বসাইয়া স্বয়ং আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিবে। তুমি শান্ত, সমাহিত হইয়া অনুষ্ঠান পদ্ধতির বিধানানুসারে ব্রহ্মোপাসনা করিবে। তাহার কোন অংশ পরিত্যাগ করিবে না। তাহার মধ্যে যাহা সংস্কৃত পাঠ, তাহাতে——ও——তোমার সহিত যোগ দিবে, বাঙ্গালা অংশ তুমি একাকী পাঠ করিবে। উপাসনা শেষ হইলে বেদীতে——ও——বসিয়া থাকিবে, তুমি তাহা হইতে নামিয়া নীচে তোমার পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিবে এবং পদ্ধতি অনুসারে বরকে ও কন্যাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মন্ত্র সকল পড়াইবে। সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে আবার তুমি বেদীর মধ্যস্থলে বসিয়া বরবধূকে পদ্ধতিলিখিত উপদেশ দিবে, তাহাতে যেন গম্ভীরতা রক্ষা হয় ও তাহা হৃদয়ে লাগে। উপদেশ দিয়া নীচে নামিয়া যথাক্রমে মন্ত্র পড়াইয়া বরবধূকে সপ্তপদী গমন করাইবে। বিনা প্রমাদে আমার এই সকল উপদেশ পালন করিবে—

যেহেতু ইহাতে ত্রুটী হইলে বিবাহ বৈধ ও সিদ্ধ হইবে না। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিবে—"

৮

"* * তোমার ছাত্র ——প্রভৃতির উপনয়নের দিন ৬ বৈশাখ ধার্য্য করিয়াছি। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া আমাকে সন্তোষ প্রদান করিবে,——আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তুমি ও —— বেদীতে বসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবে। সমাবর্ত্তনের দিন বেদ পাঠের পর "সত্যং বদ, ধর্ম্মঞ্চর প্রভৃতি যে উপদেশ দিতে হয়, তাহা তুমি দিবে এবং তাহার পরে —— বালকদিগকে বেদীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া আমি——কে ও——কে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিবেন। ১৮৮০ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৪ পৃষ্ঠাতে এই উপদেশ পাইবে। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" যে অধ্যায়ের প্রথমে আছে সে অধ্যায় সমাবর্ত্তনের দিন বালকদিগকে পাঠ করিতে হইবে। অতএব এই অধ্যায়টি সকলে মিলিয়া তাহারা সমস্বরে যাহাতে কণ্ঠস্থ পাঠ করিতে পারে এমত শিক্ষা দিবে। উপনয়নের দিন পালা করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সম্মুখে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পাঠ করিতে হইবে। এই পত্র——কে দেখাইবে।"

নিম্নে আমরা আর ৬ খানা পত্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তন্মধ্যে প্রথমখানি স্বীয় কোন কন্যার প্রতি লিখিত। অপরগুলি মহর্ষিদেবকে লিখিত স্বনাম খ্যাত আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর।

স্নেহময়ি——

তুষার জটাভার সহস্র সহস্র মস্তক আকাশ অভিমুখে উন্নত করিয়া এখানকার এই হিমালয় পর্ব্বত গম্ভীর স্বরে বলিতেছে——

We rear our mighty fronts towards Heaven,
Where foot of mortal never trod;
For we alone of nature's works
Are chosen children of our God.

Ye verdant meads, ye flowing streams,
Ye in creation have your place,
Lo! He that made you deemed you good;
But only we have seen His face.

এই পর্ব্বতের উপরে আজ কাল মেঘ, বাতাস, বিদ্যুৎ, বজ্র, মুহুর্মুহুঃ আনন্দে খেলা করিতেছে। সে খেলা দেখে কে? দিন দুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে, কোমল সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্ব্বতের উপরে পড়িল, আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল। আবার কিছু পরে এমনি বাষ্প উঠিয়া সকল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিল, যেন একেবারে সকল সৃষ্টির লোপ হইল—আবার পরক্ষণেই সম্মুখে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণে বনরাজি দীপ্তি পাইতে লাগিল। ইহা ঈশ্বরের একটি বিচিত্র কার্য্য ক্ষেত্র তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই, তাঁহার মহিমার অন্ত নাই; তাঁহার মহিমা যখন দেখিতে থাকি, তখন সকলি আর ভুলিয়া যাই। * * * ঈশ্বর তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।"

পত্র।

হিমালয়
দারজিলিং,
৭ জুলাই ১৮৮২।

ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি

আনন্দময় ; হরি কি সুধাময় পদার্থ ! সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে ? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা।"

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশব চন্দ্র সেন।

প্রত্যুত্তর।

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ।

৩০ আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ্ আফ্শোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

"কাহাকেও এমন পাই না যে আমার কথায় সায় দেয়," তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠ্ত আর খুসি হয়ে বল্তে থাকিত——

"কি মস্তি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই

তোমার সহিত আমার যোগ বন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন — সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদু পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা;" সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান—উচু নীচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি ২ শ্রাবণ ৫৩ ব্রাঃ সং।

তোমার অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।
মসূরী পর্ব্বত।

পত্র।

তারাভিউ
শিমলা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ।

পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম।

গত বর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম আপনার শরীর অসুস্থ। ইচ্ছা হয় নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেবা করি। বহু দিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? হৃদয়ের যোগ আত্মার যোগ তো আছেই, তথাপি মন চায় যে শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে।

যত দিন যাইতেছে তত ব্রহ্ম সূর্য্যের কিরণ ও ব্রহ্ম চন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে বাহিরে দেখিয়া অবাক হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনে হয় পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই, আমাদের কি সৌভাগ্য, এই সকল আনন্দলীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্ তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত, কে বা ভাবিত? এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদায় দুঃখী কৃপা পাত্র ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল! অনাদ্যনন্ত করতল ন্যস্ত! হইল কি? ছিল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারিদিকে নূতন শোভা! কোথাও গম্ভীর নিনাদে, কোথাও মধুর স্বরে ব্রহ্ম নাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দ-ধ্বনি না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আসুন, গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী

সেবক শ্রীকেশব চন্দ্র সেন।

প্রত্যুত্তর।

হিমালয় পর্ব্বত

১৪ আশ্বিন ব্রাঃ সং ৫৪।

প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ!

আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছু দিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভ সময়ে প্রেমসহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াং সমনু-স্মরেদ্যঃ। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ প্রয়াণ-

কালে মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তযোগবলেনচৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥”

“নিম্নে বসুন্ধরা উর্দ্ধে দেব লোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর।
আনন্দময়ের মঙ্গল স্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার।”

তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য! তোমার কথা আশ্চর্য্য! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্ম নাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারো—তাঁর আনন্দ-জনন সুন্দর আনন দেখ রে নয়ন সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পুনশ্চ—এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিলে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।

পাঠক! মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের প্রতি লিখিত মহর্ষির ইহাই শেষ পত্র। তিনি এই পত্রে নিজের ইহলোক হইতে প্রয়াণের কথা উত্থাপন করিয়া কেশব বাবুকেই তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই পত্র প্রাপ্তির অল্প দিন পরেই কেশব বাবু পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে মহর্ষিদেবের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমরা নিজের কথায় না বলিয়া অক্ষোত্তরণ নগরের বৈদিক পণ্ডিত মহাত্মা মোক্ষমূলর কেশব বাবু সম্বন্ধে মহর্ষির আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া কস্মোপলিশ নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতেছি। “যদিও আমি তাঁহার (দ্বারকা নাথ ঠাকুরের) পুত্র দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে কখন দেখি নাই কিন্তু আমি তাঁহার অনেক ভাল ভাল চিঠী পাইয়াছি এবং তাঁহার ভূরি ভূরি অকৃত্রিম সাধু কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি গভীর অনুরাগ ও সহানুভূতি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। তিনি কেশব চন্দ্র সেনের পৃষ্ঠপোষক বন্ধু ছিলেন। যদিও তিনি তাঁহার যুবক বন্ধুর সকল মত ও সংস্কারের অনুমোদন করিতে পারেন নাই,

তাই বলিয়া তাঁহার এই প্রবল উদ্যমশীল ছাত্রের প্রতি স্বীয় স্নেহ ভালবাসার বিন্দুমাত্র খর্ব্ব করেন নাই। কুচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়া সূত্রে কেশব চন্দ্র সেন যখন সকল বন্ধু দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন তখনও এই বৃদ্ধ তাঁহার প্রতি সমান ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন এবং এক-পুত্রের পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।”

অতঃপর মহর্ষিদেবের প্রতি কেশব বাবুর লিখিত শেষ পত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমি এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

পত্র। কানপুর

১১ই অক্টোবর ১৮৮৩।

শ্রীচরণ কমলে প্রণাম ও নিবেদন।

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পথে দুই তিন স্থানে থাকিতে হইয়াছিল, এজন্য এখানে আসিতে বিলম্ব হইল। আজ বৃহস্পতিবার, গত সোমবারে রাত্রি ২টার সময়ে এখানে পঁহুছিয়াছি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম। শরীর সম্বন্ধে আপনাকে আর কি লিখিব? আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আর সে শরীর নাই, সে বলও নাই। দেহ নিতান্ত রুগ্ন ও ভগ্ন এবং কঠিন রোগে ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ কাল হাকিমের মতে চলিতেছি। এ সকলই তাঁহার ভৌতিক খেলা, তাঁহার দিকে প্রাণকে টানিবার গূঢ় প্রেম কৌশল। কিছু বুঝিতে পারি না, কেবল মঙ্গলময়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি। যোগানন্দের উদ্যান অতি মনোহর, সেখানে আপনার সুন্দর হাফেজ পক্ষী থাকেন। জীবনে অনেক কষ্ট ও পরীক্ষা, চির দিন এইরূপ আপনি তো জানেন। কিন্তু এই রোগ শোকের মধ্যে আপনার সেই সত্য শিব সুন্দর। কাল ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রেমানন্দের আলোক। এ দীনের প্রতি বিশ্বনাথের যথেষ্ট কৃপা। আর কি বলিব? স্নেহ উপহারের জন্য বার বার ধন্যবাদ করি। যদি নিতান্ত কষ্টকর না হয় সময়ে সময়ে হস্তাক্ষর পাইলে বাধিত হইব। অন্যথা হৃদয়ে রাখিবেন।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী

শ্রীকেশব চন্দ্র সেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুগ্ধই মহর্ষির প্রধান আহার। মসূরী পর্ব্বতে আমাদের এক পাল গোরু ছিল।—ইহারা অল্প হইতে ক্রমে বহু হইয়াছিল। প্রাচীন ঋষিদিগের গোরুই প্রধান সম্পত্তি ছিল। তাঁহারা গো-সম্পত্তি লাভের জন্য যেমন প্রার্থনা করিতেন, সেইরূপ স্বীয় পুত্র পৌত্রাদির সঙ্গে সমান কামনা করিয়া তাহাদের দীর্ঘজীবনের জন্যও প্রার্থনা করিতেন। সে প্রার্থনা এই—"কুর্ব্বাণাচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্ন পানে চ সর্ব্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ।" "মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে।"

শান্ত-প্রকৃতি গোরুরা বনে আহার করিয়া গৃহে তোমাকে দুগ্ধ প্রদান করে। সেই দুগ্ধপানে তোমার শরীর সর্ব্ববিধ ভোগজ শক্তি ও তোমার মন সাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তুমি এক্ষণে সেই গোরুকে হনন করিয়া তন্মাংস ভক্ষণে যেমন আপনার প্রকৃতিকে উত্তপ্ত, খিট্‌খিটে ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিতেছ, তাঁহারা তেমন করিতেন না। তাঁহারা আন্তরিক স্নেহ মমতার সহিত তাহাদিগের সেবা করিতেন ও তৎপ্রদত্ত দুগ্ধ পানে আপন শরীর মনকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করিয়া নিজের স্বভাব, গৃহ, অরণ্যকে সুন্দর ও মধুময় করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের গোরুগুলি পর্ব্বতের উচ্চ নীচ দুরারোহ স্থান সকলে চরিয়া বেড়াইত। অনেক সময়ে পালকের সঙ্গে আমি তাহাদের সেবা করিতাম। মনে করিতাম, ইহা আশ্রম-শিষ্যের কর্ত্তব্য। বৎসগুলিকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, আমি তাহাদিগকে নূতন শ্যামল তৃণ ছিঁড়িয়া খাওয়াই-তাম। প্রাতের উপাসনার পর মহর্ষি ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিতেন। মহর্ষি-দেবের মুখে শুনিয়াছি যে, মরী পর্ব্বতে বাসকালে তাঁহার একটা গাভী ছিল, সে প্রত্যহ দশ শের করিয়া দুগ্ধ দিত। মহর্ষি নিয়মিত আহারের উপরে এই সমস্ত দুগ্ধ পান করিতেন।

মসূরী পর্ব্বতে শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হইলে যখন সকল লোক নীচে চলিয়া যাইত, উচ্চ শৃঙ্গ সকল হইতে অদৃষ্ট পূর্ব্ব নূতন নূতন পক্ষীরা এবং নূতন নূতন পশুরা পালে পালে নিম্নতর শৃঙ্গ দিয়া উপত্যকার অরণ্যে চলিয়া যাইত, তখন মহর্ষি মসূরীর পাদমূলে দেরাদূন নামক উপত্যকায় আসিয়া বাস করিতেন। গুচ্ছপাণি নামক নির্ঝরিণীর সন্নিকটে দুইটি প্রকাণ্ড প্রাচীন চম্পক বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তথাকার লোকেরা বলিয়া থাকে যে, দ্রোণাচার্য্য এই স্থানে তপস্যা করিতেন। এই উপত্যকার চতুর্দ্দিক পর্ব্বত মালায় পরিবেষ্টিত। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইত, কিন্তু এইক্ষণে তাহা শুষ্ক হইয়া রেখা মাত্রে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার দ্বারা এই স্থানের প্রাচীনতা ও মনোহারীতা স্মরণ হইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। তখন কুরুপাণ্ডবেরা এই স্থানে বাণ শিক্ষা করিতেন। দেখিলে মনে হয়, বাণ শিক্ষারই উপযুক্ত এই স্থান। কয়েক বর্গক্রোশ গোলাকার ভূমি আর্য্যশিশুর ব্যায়াম ভূমি ছিল, ইহা স্মরণ করিলে এই দুর্ব্বল ধমনিতেও রক্তপ্রবাহ সতেজ হয়।

মনু যে বলিয়াছেন, "ন চিরং পর্ব্বতে বসেৎ।" এ কথার তাৎপর্য্য এখন বুঝিতে পারিলাম। বহু দিন পর্ব্বত বাস ও পর্ব্বত ভ্রমণে মহর্ষির শরীর পীড়াক্রান্ত হইতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হইল, পরিপাক শক্তির হ্রাস হইল—ইহা অতিশয় পর্ব্বত বাসের ফল। ইহার সঙ্গে জরা আসিয়া তাঁহার শরীরকে অল্পে অল্পে আক্রমণ করিল। এ বিষয়ে মহর্ষির নিজ মুখের কথা তাঁহার লিখিত পত্রাংশ হইতে এখানে প্রকাশ করিতেছি।

"এই ক্ষণে আমার জরার অবস্থা, অতএব শরীরের সুস্থতার আর প্রত্যাশা নাই। কালের ধর্ম্ম অনতিক্রমনীয়, এজন্য উদ্বিগ্ন হইবে না। উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। তোমাদের শ্রীসৌভাগ্যের আর অন্য উপায় নাই।"

"কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিতে তুমি আমাকে অনুরোধ করিয়াছ। কিন্তু এই ক্ষণে আমার কোন স্থানেই শরীর ভাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই পুণ্যভূমি হিমালয়েই আমার শেষ দিন অবসান হইবে—এখানেই আমার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিব।"

"এখনো তো তুমি আমার সংবাদ পাইতেছ, যদি কলিকাতায় থাকিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এত দিনে আমার আর কোন সংবাদ পাইতে না। বাঙ্গলার দাবানল ও জ্বর বহ বাতাস এখানে নাই; তাই এই জরাজীর্ণ শরীর লইয়াও এই হিমালয়ের মধ্যে এত দিন টেঁকিয়া আছি। এই ভাঙ্গা খাঁচা আর পাখিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার আর অনুভব হয় না। স্থূল দ্রব্য আর জীর্ণ হয় না। দুগ্ধ প্রভৃতি জলীয় বস্তু ভক্ষণ করিয়া আছি। * * * শরীরের যন্ত্রে মড়িচা ধরে আর তাহা ভাল চলে না। সে যন্ত্র সকল যন্ত্রণা হয়েছে। তবু যখন "বিন্দু বিন্দু বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত"। সেই অমৃত পুরুষের সহবাসেই আত্মার আরাম। নতুবা এ সময়ে আমাকে আর কেহই আরাম দিতে পারে না। তিনি ধাত্রী হইয়া নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এ সৌভাগ্য অতি দুর্লভ।"

মসূরী অবস্থান কালে হঠাৎ এক দিন মহর্ষির পদে স্ফোটক দেখা দিল। তাহা পাকিল। ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিলেন এবং তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু সে ঘা আর সারে না। ক্রমশঃ দুইটা হইল। দুই পা স্ফীত হইল। অবশেষে ডাক্তার সাহেব দুরারোগ্য কার্বঙ্কেল বলিয়া মহর্ষির জীবনে নিরাশ হইলেন। তিন মাস অতিবাহিত হইল—আমরা দেরাদূনে নামিয়া আসিলাম। এখানে এক জন সুবিজ্ঞ জর্ম্মান দেশীয় ডাক্তার ছিলেন। তিনি মহর্ষির পীড়া পরীক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ে তিন দিন বিবেচনার পর ঔষধ দিলেন এবং সমস্ত পা ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া রাখিতে ব্যবস্থা দিলেন। ইঁহার চিকিৎসাতে দুই মাসে ঘা সারিল, পদের স্ফীতি কমিল। কিন্তু এখানে অন্যতর ব্যাধি হইল—কাশী ও জ্বর। এ জ্বর অত্যন্ত প্রবল, কাশী দুর্বিসহ, মস্তিষ্কের প্রদাহ তীব্র। শরীর শুষ্ক, মুখশ্রী মলিন, শীর্ণ। ডাক্তার সাহেব তাহাকে রাত্রে স্নান করাইয়া ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ সুস্থ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু নিত্য কাষ্টর-অইল সেবনে তাঁহার শরীর নিয়মিত হইতে লাগিল। শীতাবসানে দুর্ব্বল শরীরে পুনরায় পর্ব্বতারোহণ করিলেন। এখন আর ভাত, লুচি, কিম্বা রুটি মহর্ষি খাইতে পারেন না। কেবল দুগ্ধ ও শাক মূলাদির সুপ তাঁহার পথ্য হইল। কিন্তু এ সুপও তাহার পরিপাক হয় না। কেবল দুই বেলা

দুই বাটি দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। আমার ভয় হইল। যদি এই আত্মীয় স্বজনবিহীন পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার দেহান্ত হয়, তবে আমি একাকী কি প্রকারে তাঁহার যোগ্য সমাধি করিতে পারিব? দেশে যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, প্রত্যহ কত সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি শুনিলেন না—বলিলেন, "আমি কোথায় নিম্ন ভূমিতে যাইব? আমি এই হিমালয় হইতেই সেই দেবালয়ে প্রস্থান করিব।" এক দিন দেখি যে, কলিকাতা হইতে ৬০০০, ছয় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগচ আনাইয়া আমার হস্তে দিলেন। বলিলেন যে, "এই টাকা এখানকার ব্যাঙ্কে তুমি মজুত করিয়া রাখ, যদি এখানে আমার শরীরের অবসান হয় ও সে মৃত শরীর লইয়া তুমি বিপদে পতিত হও তখন এই অর্থের দ্বারা সাহায্য পাইবে।" কয়েক দিন পরে আমি সেই টাকার কাগচ ব্যাঙ্কে রাখিতে যাইতেছি, বলিলেন, "কিছু দিন পরে রাখিও।" কিছু দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন কি ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিব? বলিলেন," আর কয়েক দিন পরে দিও"।

এক দিন দেখি যে, এক ডাণ্ডিতে চড়িয়া একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত সীতা নাথ ঘোষ। আসিয়া মহর্ষির পদতলে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "আমি যে, তাড়িত বিদ্যাদ্বারা চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি এবং তাহার প্রচার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণার্থ যে ব্যয় হইয়াছে তাহাতে সমধিক ঋণে জড়িত হইয়াছি। এক্ষণে আমার বিষয় সম্পত্তি বিক্রীত হইতে চলিল। যদি আপনি আমাকে এই ঋণ জাল হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার সন্তানেরা অন্নাভাবে মারা পড়িবে।" তাঁহাকে স্নানাহার করিতে অনুমতি করিয়া মহর্ষি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "শাস্ত্রী! সীতা নাথ বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। তোমার নিকটে যে কোম্পানীর কাগচগুলি আছে তাহা উঁহাকে দিলে ভাল হয়। তুমিই হস্তে করিয়া দিও ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে।" বৈকালে সীতা নাথকে নিকটে ডাকিলেন এবং কাগচের পৃষ্ঠে এক এক করিয়া দানের অনুমতি লিখিয়া আমার হাতে দিতে লাগিলেন আমি তাহা সীতা নাথ বাবুর হস্তে দিতে লাগিলাম। দান শেষ হইলে মহর্ষি বলিলেন যে, "তুমি ইহা কাহাকেও বলিও না।" সীতা নাথ

তাহা স্বীকার করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞ ভরে পর দিন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সীতা নাথ পাইলেন আট হাজার টাকা, যেহেতুক এই ছয় হাজার টাকার কাগচের দুই হাজার টাকা স্থদ পাওনা ছিল।

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বুচিয়া পান্টালু মহর্ষিকে দেখিবার জন্য হৃদয়ের অনুরাগে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া মসূরীর উদ্দেশে আগমন করিতেছেন সংবাদ পাওয়া গেল। এক দিন আহারান্তে মহর্ষির নিকটে বসিয়া আছি, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, ভৃত্য আসিয়া এক খানি কার্ড দিল, তাহাতে ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে, "বুচিয়া পান্টুলু"। বিশ্রুত নাম ও ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক বুচিয়া পান্টুলু অবশ্য ইংরাজী বেশ ও ব্যবহার সম্পন্ন হইবেন মনে করিয়া মহর্ষির আদেশে প্রথমে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া পরে মহর্ষির নিকটে আনয়ন করিতে চলিলাম। বহিঃ প্রাঙ্গনের প্রান্তদেশে গিয়া দেখি যে, তথাকার বারাণ্ডায় বসিয়া কয়েক জন বরষাসিক্ত ডাণ্ডিওয়ালা শীতে কম্পিত হইতেছে। আমি তাহাদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বুচিয়া পান্টুলু কোথায়? তাহাদের মধ্য হইতে এক জন উঠিয়া বলিলেন, "আমিই বুচিয়া পান্টুলু।" তিনি হিন্দিভাষানভিজ্ঞ এবং ইতি পূর্ব্বে কখন দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করেন নাই। ডাণ্ডিতে চড়িয়া পর্ব্বতারোহণকালে পতন ভয়ে তিনি তাহা হইতে অবতরণ করেন এবং সেই কুলিদিগকে অগ্রে করিয়া তাহাদের পশ্চাতে হাঁটিয়া ভিজিতে ভিজিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলাম এবং স্নানাহারের অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি মহর্ষিকে না দেখিয়া স্নানাহার করিতে চাহেন না। আমি তাঁহাকে মহর্ষির এইরূপ নির্দ্দেশ বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনি প্রথমে স্নানাহার করিয়া আমার সঙ্গে মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহর্ষি যতই অগ্রসর হন, বুচিয়া পান্টুলু ততই পশ্চাদপদ হইয়া সরিয়া যান। মহর্ষি যত পশ্চাদপদ হন তিনি তত অগ্রসর হইয়া তাঁহার দিকে যান। মহর্ষি নিরুপায় হইয়া এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, অমনি বুচিয়া পান্টুলু তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পাঁচ মিনিটকাল পড়িয়া রহিলেন। তদনন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহর্ষির মুখের দিকে তাকাইয়া করযোড়ে অতি মধুর স্বরে সংস্কৃত

মন্ত্রে স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি আবার দেরাদূনে অবতরণ করিলেন। এখানে ডাক্তার ম্যাক্লারণ সাহেবকে ধরিলাম যে, তিনি মহর্ষিকে দেশে যাইবার অনুরোধ করেন। সাহেব তাহা করিলেন এবং মহর্ষি এই অনুরোধে কিছু দিনের জন্য পর্ব্বতা-বাস পরিত্যাগ করিয়া রেলযোগে কাশীধামে আগমন করিলেন। ৭ দিন এখানে বজরাতে অবস্থিতি করিয়া ঐ বজরাতেই গাজিপুর আসিলেন। গাজিপুর সহরের প্রান্তে নির্ম্মল গঙ্গাবক্ষে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। এখানে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা প্রতি দিন শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে মহর্ষিদেবের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই সুযোগে তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া এক দিন উৎসব করিলেন ও তাঁহাদের নির্ব্বাচিত ভূমিতে মহর্ষির দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের ইষ্টক প্রোথিত করিয়া লইলেন। এখানে গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিভাগের উচ্চ পদবীর এক জন ইংরাজ থাকেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ ও ধার্ম্মিক। মহর্ষিদেবের নাম ও তাঁহার আগমন শ্রুত হইয়া তিনি স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ধর্ম্মালাপে আপ্যায়িত হইয়া পর দিন নিজ উদ্যানের অতি বৃহৎ সুগন্ধী গোলাপস্তবক প্রেরণ করিয়া মহর্ষির সংবর্দ্ধনা করেন। মহর্ষি এখানে যত দিন ছিলেন, সাহেব তত দিন প্রত্যহ তাঁহার তত্ত্ব লইতেন।

প্রায় এক মাস হইল আমরা দেরাদূন পরিত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া মহর্ষির অন্নে রুচি হইয়াছে ও তিনি কিছু কিছু ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমারও সাহস ও উৎসাহ হইয়াছে। আমি তাঁহাকে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বঙ্গদেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। এক দিন প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার পর আমাদের বজরা বক্সার হইতে উত্তরাভি-মুখে চলিল। কিছু দূরে সরযূ নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। মহর্ষি বলিলেন, এই সরযূ দিয়া অযোধ্যাতে যাইব এবং সেখান হইতে স্থলপথে গমন করিয়া পুনরায় মসূরী পর্ব্বতে আরোহণ করিব, আমি তাঁহার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কথা কহিলাম। তিনি বলিলেন, এই পথটা সমুদায় তুমি আমার সহিত তর্ক করিতে করিতে চল, আমি সরযুর মুখে যাইয়া আমার

'রায়' দিব। আমি তাহাই করিলাম। কলিকাতায় গেলে তাঁহার শরীর ভাল থাকিবে, ইহার যুক্তি দেখাইতে দেখাইতে সরযুর মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে বজরা লাগিল এবং আমাদের আহারাদি সম্পন্ন হইল। আহারান্তে মহর্ষি স্বীয় আসনে উপবেশন করিয়া আমাকে ডাকিলেন এবং সরযু দিয়া অযোধ্যার দিকে নৌকা লইয়া যাইবার হুকুম মাঝিকে দিতে অনুমতি করিলেন। আমি আর বাক্-নিষ্পত্তি না করিয়া অবনত মস্তকে, ম্লানমুখে আসিয়া মাঝিকে বলিলাম, সরযু দিয়া অযোধ্যার দিকে নৌকা লইয়া চল।

সরযুর অন্যতর নাম ঘর্ঘরা। এই ঘর্ঘরার বিশাল জলস্রোত ঘর্ঘর শব্দে প্রবলবেগে আসিয়া গঙ্গার বক্ষে পতিত হইতেছে। এখানে দাঁড় বাহিয়া নৌকা পরিচালন করা অসাধ্য। দাঁড়ীরা তীরে নামিয়া গুণ টানিতে লাগিল। কিন্তু ভীষণ জলস্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা যাইতে পারে না। অর্দ্ধ ক্রোশ পথও যাওয়া হয় নাই, এমন সময়ে সূর্য্য অস্তমিত হইল। মহর্ষির আদেশ হইল, মধ্য নদীতে নৌকা নোঙ্গর কর। তাহাই হইল। আমরা এই সরযুর বিশাল বক্ষে রাত্রি যাপন করিলাম। সমস্ত রাত্রি নদীর কর্ কর্, থর্ থর্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অর্দ্ধ জাগরণে কাটাইলাম। মনে করিলাম, মৃত্যুর বক্ষে শয্যা পাতিয়াছি, কখন্ আছি, কখন্ নাই। পর দিনও চলিলাম। তৃতীয় দিবস যাইতে যাইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে দেখি যে, এক খানি গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদীর তীরে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, সে পথ বিপদ সঙ্কুল হইয়াছে। আমার ছোট বজ্‌রা ও পাকের নৌকা তাহা অতিক্রম করিয়া অনতি দূরে এক সুন্দর চড়াতে লাগিল। দেখি যে, মহর্ষির বজ্‌রা আসে না। ডাঙ্গা দিয়া দেখিতে গেলাম। দেখি যে, সেই ভাঙ্গনের মুখে মহর্ষির বজ্‌রা বিপন্ন। সে বজ্‌রা কেহ টানিয়া আনিতে পারিতেছে না। গুণ ছিঁড়িয়া যাইতেছে ও বজ্‌রা জলস্রোতে ও তাহার আবর্ত্তে পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তখন আমাদের সকল নৌকার গুণ ও মাজি ও মাল্লা লইয়া গিয়া কোন প্রকারে মহর্ষির বজ্‌রাকে টানিয়া আনা হইল। সে রাত্রি সেই চড়াতেই কাটান গেল। পর দিন প্রাতে মহর্ষি উপাসনান্তে দুগ্ধপান করিয়া বলিলেন, পূর্ব্ব দিকে নৌকা ছাড়িয়া দাও। আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিয়া দুই ঘণ্টাতে বাঁকীপুর আসিয়া পঁহুছিলাম। এখানে

আসিয়া মহর্ষি আমাকে বলিলেন যে, লক্ষ্ণৌ যাইয়া আমার জন্য একটি বাড়ী ভাড়া কর। আমি সেখানে এক মাস থাকিয়া পুনরায় মসূরী পর্ব্বতে যাইব। পর দিন প্রাতে মহর্ষির নামের এক ঝুড়ি চিঠী ডাকঘর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এক খানি চিঠীতে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জমীদারীর সুদক্ষ তত্ত্বাবধারক তাঁহার প্রিয় জামাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার একটু ভাবান্তর হইল। তিনি বলিলেন, "সারদা আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন কেন জান? তিনি আমার জন্য পরলোকে বাড়ী ঠিক করিতে গিয়াছেন।" অতঃপর বলিলেন, "এখন পর্ব্বতে যাওয়া হইবে না। বাড়ীর সকলে শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একবার বাড়ী যাইব।" আমরা রেলযোগে প্রথমে শান্তিনিকেতনে আসিলাম এবং তথা হইতে কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। মহর্ষি বাড়ীতে তিন দিন থাকিলেন। অনন্তর বজ্‌রাযোগে গঙ্গাবক্ষে বেড়াইতে বাহির হইলেন। মহর্ষি এই যে বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন তাহার পর আর কখন তথায় প্রবেশ করিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চুঁচুড়াতে গঙ্গাবক্ষে ওলোন্দাজ নির্ম্মিত একটি দ্বিতল অতি সুন্দর বাড়ী। এখন ইহাকে মাধব দত্তের বাড়ী বলে। সে বাড়ী প'ড়ো, কেহ সেখানে বাস করে না। অনেকে বলেন, এ বাড়ীতে একটি ব্রহ্মদৈত্য আছেন। ১৮০৫ শকের পৌষ মাসে এই বাড়ী ভাড়া লইয়া মহর্ষি তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে একটি পারিবারিক দুর্ঘটনাকে মহর্ষির আলিঙ্গন দিতে হইয়াছিল। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর। সংবাদ আসিল যে, তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। প্রত্যহ সংবাদ আসিতে লাগিল যে, তিনি কেমন আছেন, কেমন নাই। প্রত্যহ এ সংবাদ আমি মহর্ষিকে জানাইয়া থাকি। এক দিন রাত্রে পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে যে, হেমেন্দ্র বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদ তাঁহাকে আমার দিতে হইবে। পর দিন প্রাতে উপাসনান্তে দুগ্ধ পান করিয়া মহর্ষি বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন। সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বলিলেন, "আজিকার খবর কি? বলিলাম, "আজিকার খবর ভাল নহে, সেজো বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" "মৃত্যু হইয়াছে?" বলিয়া একটু দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদু নাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জান যে, মৃত শরীর কি ভাবে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হস্তপদাদি সমানভাবে রাখিয়া আপাদ মস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করত অভ্রমিশ্রিত ফল্গু ও পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না? আর বিদ্যারত্নকে এখানে আসিতে লেখ, কি প্রকারে হেমেন্দ্রের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা উচিত।"

১৮০৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি বোম্বাই যাত্রা করেন। পথে আগ্রা,

জয়পুর, বিথুরা, পাহলনপুর ও আমদাবাদে অবস্থিতি করিয়া বোম্বাইয়ের উপ-নগর বন্দোরা নামক স্থানে সমুদ্র তীরে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি যখন আমদাবাদে পঁহুছিলেন, তখন তথাকার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ সারাভাই প্রমুখ অনেক মাননীয় লোক রেলের ষ্টেষণে আসিয়া মহর্ষিকে গ্রহণ করিলেন এবং তথাকার ছোট শেঠের রমনীয় উদ্যান বাড়ীতে মহর্ষির বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। ভোলা নাথ সারাভাই ইংরাজী শিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, শেঠেরা বস্ত্র-কলের অধিকারী মহাধনী নিষ্ঠাবান হিন্দু। ইহারা একত্রে প্রত্যহ বৈকালে মহর্ষির নিকটে আসিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। এখানকার জৈন মন্দির সকল, নারায়ণ স্বামীর ধর্ম্মাশ্রম মহর্ষি অতিশয় প্রীতি ও আগ্রহের সহিত দেখিলেন। ভোলা নাথ সারাভাই ও তথাকার বহুভাষাবিৎ বিলাত ফের্‌তা জাতিভ্রষ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে দক্ষিণে ও বামে বসাইয়া মহর্ষি এক দিন তথাকার প্রার্থনা সমাজে উপাসনা করিয়া উপদেশ দিলেন। দেখিলাম, সেখানকার ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের গৃহ্য অনুষ্ঠানের জন্য মহর্ষিকৃত অনুষ্ঠান পদ্ধতি গুজরাঠী ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা সেই গ্রন্থ মহর্ষিকে উপহার দিলেন। ভোলা নাথ সারাভাইএর বাড়িতে গিয়া যখন তিনি তাঁহার বৈঠকখানায় বসিলেন, তখন ভোলা নাথ সারাভাই মহাশয়ের স্ত্রী ও বয়স্ক পুত্র কন্যাগণ আসিয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদের মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহারা সকলে মহর্ষিকে ঘিরিয়া বসিয়া কত হাস্য ও আহ্লাদ পূর্ব্বক গল্প করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, এ যেন মহর্ষির কলিকাতার বাড়ী ও ইহাঁরা সকলে মহর্ষির পুত্র কন্যা। দেখিলাম, এই সকল মহিলা অন্তঃপুর রক্ষিতা অথচ স্বাধীনা কিন্তু অচঞ্চলা; অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, পবিত্রা ও লজ্জাশীলা। আমদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া বন্দোরা নগরে মহর্ষিদেব যে বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন তাহা অনন্ত সমুদ্রের বেলা ভূমির উপরে। সমুদ্রে যখন জোয়ার আসিত তখন ইহার উদ্যান ও গৃহের সোপানতল জলে পূর্ণ হইয়া যাইত। মহর্ষি প্রাতে উপাসনান্তে সমুদ্র-তীরে বেড়াইয়া আসিতেন। অতঃপর সমুদ্রদিগ্‌বর্ত্তী গৃহ-সোপানে সমুদ্রকে সম্মুখে করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেন। সম্মুখে অনন্ত অপার জলধি কখন বা উত্তাল তরঙ্গে গর্গ

মেদিনী সমাচ্ছন্ন করিয়া নৃত্য করিতেছে, কখন বা দিগ্দিগন্ত সমাবৃত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে। মহর্ষি পলকহীন নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। মহর্ষি কখন বা অসাড়, নিস্তব্ধ; কখন বা ভাবে মোহিত হইয়া গাহিতেছেন—"চমৎকার অপার জগত রচনা তোমার, শোভার আগার বিশ্বসংসার।" কখন বা গাহিতেছেন—"অকূল ভবসাগরে তার হে তার হে চরণ-তরি দেহি অনাথ-নাথ হে।" কখন বা—"শান্তি- সমুদ্র তুমি গভীর অতি অগাধ আনন্দ-রাশি।"

এখানকার পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম, আর্য্য ও থিওসফিষ্ট প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোক মহর্ষিকে সমান আদর ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিন বোম্বাই হইতে ২১ জন আর্য্যসমাজের সভ্য আসিয়া মহর্ষিকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সমাজে উৎসব করিলেন। আর এক দিন তথাকার বিদ্বজ্জনেরা সমবেত হইয়া মহর্ষির সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের স্বদেশীয় উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সংকীর্ত্তন করিয়া মহর্ষির প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। তদনন্তর তাঁহাদের মধ্যস্থলে মহর্ষিকে উপবেশন করাইয়া সকলে প্রীতিভোজন করিলেন। ইহাতে মহর্ষির প্রতি তাঁহাদের সমধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। বম্বের প্রার্থনা সমাজের উপাচার্য্য ও কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বামন আবাজী মোদক ও ঋগ্বেদ সংহিতার ও থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুকা রাম তাত্যা মহর্ষির অনুগত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মহর্ষি মনে করিয়াছিলেন যে, এই বন্দোরার সমুদ্রতীরেই তাঁহার শেষ জীবন যাপন করিবেন। কিন্তু বিধাতার তাহা অভিপ্রেত নহে। এখানে ছয় মাস প্রবাসের পর তাঁহার শিরোঘূর্ণনের পীড়া হইল। এখানকার ডাক্তারেরা তাঁহাকে সমুদ্রতীর ছাড়িয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

১৮০৮ শকের আষাঢ় মাসে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মহর্ষি বম্বের প্রধান ষ্টেষণে রেলের গাড়ির মধ্যে বঙ্গদেশে আসিবার জন্য বসিয়াছেন। এখানকার সকল ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বিদায় দিতে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত। পরিচিত এবং অপরিচিত সকলেই মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া

তাঁহার আলিঙ্গন গ্রহণ করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে মহর্ষির অপরিচিত পরম ভাগবৎ এক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভক্তির সহিত মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাজ্ঞা করিলেন। মহর্ষির হৃদয়স্থ নির্ব্বিষয় ধর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ প্রীতি কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, কি অবতারবাদী, কি জ্ঞানপন্থী, কি ভাবপন্থী সকলকে অধিকার করিয়াছিল, তাই দেখিতে পাই সকলেই নির্ব্বিশেষে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আবার চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে সেই বাড়ীতে মহর্ষি বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার শিরোঘূর্ণন সারিল, কিন্তু তাঁহার শরীরের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুর্ব্বলতার জন্য তিনি পৌষ মাসে এক দিন স্নানাগারে যাইতে যাইতে পড়িয়া গেলেন। চাকরেরা সঙ্গে ছিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বিষম আঘাত প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিল। তাঁহার শিষ্য ও অনুরক্ত জনেরা এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন। এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে মহর্ষির প্রতি তাঁহাদের ভক্তিকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কর্ত্তব্যতা জাগ্রৎ হইল। এক দিন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিব নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষি-দেবকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের অনেক নূতন ও যুবক ব্রাহ্ম ও মহিলারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারা সকলে মহর্ষিকে দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্ত করেন, আর মহর্ষি উপদেশ ও অর্থদ্বারা এ যাবৎ সাধারণ সমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য সকল ব্রাহ্ম সমবেত হইয়া এক অভিনন্দন প্রদান দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও মহর্ষির নিকট হইতে শেষ উপদেশ ও অশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন, ইহাই ইচ্ছা। কিন্তু এই কার্য্যে যে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হইবে এবং অভি-নন্দন গ্রহণ ও উপদেশ প্রদানে মহর্ষির মনে যে উত্তেজনা হইবে তাহা তাঁহার এই শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। তথাপি পণ্ডিত শিব নাথ শাস্ত্রী ও সাধারণ সমাজের সভাপতি পরলোকগত মহাত্মা শিব চন্দ্র দেবের নিতান্ত অনুরোধে মহর্ষি তাহাতে সম্মত হইলেন। মাঘোৎসবের শেষ দিনে ১৭ মাঘ তারিখে চুঁচুড়াস্থ মহর্ষির আশ্রমে সকলে সমবেত হইয়া অভিনন্দন দিবেন স্থির হইল। এখন আর মুখে মুখে দীর্ঘ উপদেশ দিবার মহর্ষির শক্তি নাই, অতএব তিনি যে উপদেশ দিবেন তাহা ধীরে ধীরে আমাকে বলিতে লাগিলেন ও আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

১৭ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘণ্টার সময়ে দেখা গেল যে, নানা প্রকার রঙের নিশান ও ফুলপত্রে সজ্জিত এক খানি জাহাজে পূর্ণ প্রায় পাঁচ শত ব্রাহ্ম ও

ব্রাহ্মিকা ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ দিকে, আশ্রম হইতেও দুন্দুভি দ্বারা তাঁহারা সাদরে আহূত হইতে লাগিলেন। জলপথে ও স্থলপথে সমাগত হাজার ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা দ্বারা আশ্রম প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া গেল। ১১টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া অধিকাংশ লোকেই মধ্যাহ্নে খেচরান্ন ভোজন করিলেন এবং মহর্ষির দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া সকলে অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে উপবেশন করিয়া রহিলেন। যখন অপরাহ্ণ ২টা বাজিল তখন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব ও পণ্ডিত শিব নাথ শাস্ত্রী মহর্ষিদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাতে আনয়ন করিলেন। মহর্ষির আগমনে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিলে পর ধর্ম্মপ্রাণা কুমারী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু মহর্ষির গলদেশে পুষ্পের মালা প্রদান করিলেন। তদনন্তর পণ্ডিত শিব নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

অভিনন্দন।

ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর
প্রধানাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য!

অদ্যকার দিন আমাদিগের পক্ষে সুদিন, যেদিন আমরা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ, পবিত্র মাঘোৎসবের আনন্দকর সময়ে আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছি। দিন দিন আপনার শীর জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা বহুসংখ্যক নরনারী আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা জানি, আমাদের সমাগমে আপনার মনে যে উত্তেজনা হইবে তাহাও আপনার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাতে প্রার্থনীয় নহে তথাপি আমাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাকে দেখিবার জন্য ও আপনার ওই পবিত্র মুখের কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য এত উৎসুক যে, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আপনাকে এই ক্লেশ দিতে হইয়াছে।

আপনার ন্যায় ব্রাহ্ম সমাজের হিতকারী বন্ধু কে? মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে, তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে

প্রায় সকলেই যখন ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন, যখন ইহার অন্তরে দুর্ব্বলতা ও বাহিরের প্রবল বিপক্ষকুল ইহাকে অবসন্ন দশায় পতিত করিল, যখন দেশব্যাপী ঘন নিবিড় অন্ধকার ও বিবিধ দুর্নীতির মধ্যে এই সমাজ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, যখন ইহার অঙ্কুরিত দেহে জল সেচন করিবার কেহই থাকিল না, যখন উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার লোক অধিক ছিল না বরং নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম করিবার সকল কারণই বিদ্যমান ছিল, তখন আপনি বিধাতার মঙ্গল হস্তদ্বারা নীত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া ও ইহার কার্য্য ভার নিজ মস্তকে লইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার সেবাতে আপনার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়া ইহার অবসন্ন দেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। আপনার আগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্টা প্রধানতঃ কতকগুলি কুসংস্কারের প্রতিবাদে ও কতকগুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্য্যবসিত হইত। আপনিই সত্য-স্বরূপের অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আধ্যাত্মিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্ম সমাজকে অনেক কুসংস্কার হইতে উন্মুক্ত করিরাছেন; আপনি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া অনেক সত্যামৃত উদ্ধার পূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত জীবন লাভ করিবার পথপ্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে নিজ চেষ্টা এবং বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা দেশ মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ উপসনা প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক তদনুসারে নিজে সাধন করিয়া অধ্যাত্ম যোগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং নিজ জীবনে জ্ঞান প্রীতি ও ঈশ্বর সেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্ম সমাজ আপনার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী।

কেবল ব্রাহ্ম সমাজ কেন, সমগ্র ভারত সমাজ আপনার নিকটে ঋণী। পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা বহু দিন হইতে এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আপনি তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে ও ভারতের

ধর্ম্ম-চিন্তাকে জাগ্রত ও আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; শত শত নরনারীর হৃদয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন; এবং শত শত ব্যক্তিকে সংসারাসক্তির ও পাপাসক্তির করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এমন বন্ধু কয় জন? আমরা এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আপনার চরণে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিতেছি।

আমরা আপনারই আধ্যাত্মিক সন্তান; আপনারই শ্রম ও কার্য্যের উত্তরাধিকারী। আপনি যে গুরুভার, উৎসাহ, অনুরাগ ও স্বার্থ-ত্যাগের সহিত চির দিন বহন করিয়া আসিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন সেই ভার সেইরূপ বিশ্বাস নির্ভর ও আত্মসমর্পণের সহিত বহিতে পারি। আপনি আমাদিগকে যে গভীর আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহা আমরা প্রাণপণে সাধন করিতে পারি। "তাঁহাকে প্রীতি করা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"—এই অমূল্য সত্য আপনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই উপদেশ আমরা কখন বিস্মৃত না হই। আপনার কার্য্যের শক্তি যত দিন ছিল তত দিন সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখন আপনি জরা ও অসুস্থতা বশতঃ যদিও কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তথাপি এখনও আপনার জীবন আমাদিগকে বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে; এবং এখনও আমরা ব্রাহ্ম সমাজের বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি। আপনি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা ভাবিলেও আমাদের আনন্দ। অতএব ঈশ্বরের চরণে আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা, যে তিনি এখনও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখুন। আপনি নিরুপদ্রব শান্তিতে জীবনের অবসান কাল যাপন করুন। আমাদিগকে দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও পরামর্শের দ্বারা ধর্ম্মসাধন ও সেই সত্য স্বরূপের নাম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমরা আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে দেহ মন নিয়োগ করি; এবং উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে তাঁহার নাম প্রচার করি; আপনি দেখিয়া সুখী হউন। যে ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতিতে আপনার এত

আনন্দ, সেই ব্রাহ্ম সমাজের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া আপনি জীবনের শেষ অবস্থায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

আজ একবার আমাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন; এমন দিন ছিল যখন আপনার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন দেখুন ঈশ্বরকৃপায় কত শত নরনারী সেই পবিত্র অগ্নি ধারণ করিয়াছেন; দেখুন কত মহিলা কত পরিবার আজ এই কৃতজ্ঞতা উপহার লইয়া আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সমবেত সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করুন। ইতি।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ।

অতঃপর মহর্ষিদেবের আদেশ ক্রমে তাঁহার প্রদত্ত প্রত্যুত্তর লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

প্রীতিভাজন শ্রীমৎ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের
সভ্যগণ তন্নিষ্ঠেষু।

সৌম্য!

তোমরা সকলে মিলিয়া আমার হস্তে যে অমূল্য উপহার প্রদান করিলে, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম—ইহা কৃপণের ধনের ন্যায় অতি সন্তর্পণে চির-জীবন আমি রক্ষা করিব। অদ্য আমার কি আনন্দের দিন। পূর্ব্বে যখন আমি কোন এক জন ব্রাহ্মকে দেখিতে পাইতাম, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরিত না। এখন এখানে শত শত নরনারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনুরক্ত দেখিয়া আমার কত আনন্দ! হৃদয়ে হৃদয়ে অনুরাগের সহিত অনুরাগ মিশ্রিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের ধারা এখানে প্রবাহিত হইয়াছে। আনন্দের এমন আস্বাদ আমি আর কখন পাই নাই। "এষহ্যেবানন্দযাতি"। ইনিই আনন্দবিধান করেন।

এত গুলিন জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ পরিবারবদ্ধ ব্রাহ্মদিগকে এ জীবনে দেখিয়া যাইব ইহা আমার চিন্তার ও আশার অতীত। আমার এমন কি বল, কি পুণ্য যে, এই প্রশস্ততম, উন্নততম ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের আমি উপযুক্ত সেবক হইতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের, ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, যাহা কিছু করিয়াছি তাহা কেবল তাঁহারই কৃপাতে—তাঁহারই সাহায্যে। আমার হৃদয়ে তিনি আসীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন তাহারই অনুযায়ী চলিয়া এতটুকু যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি। সমুদায় আকাশ যাঁহার গুরু ভার বহন করিতে পারে না, আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে সেই ভার পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য কি! তাঁহার কৃপাতে মাটী যে, সে সোণা হয়, পঙ্গু গিরিকে লঙ্ঘন করে। "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং—ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং, পাপ নাশ হেতুরেব ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।" তোমরা তাঁহার কৃপা অনুক্ষণ প্রার্থনা কর, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার আদেশ অনুযায়ী অটলভাবে চলিতে থাক, ব্রাহ্ম সমাজের অশেষ উন্নতি হইবে। চির দিন তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস, নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার পবিত্র উপাসনার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রদর্শন কর, ইহাতে আর আর সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সঙ্গী করিয়া লইতে পারিবে। তোমাদের সহিত এমন পবিত্র সম্মিলন-সুখ এ জীবনে আর উপভোগ করিবার আমার আশা নাই, আমার তো কথাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি এক্ষণে তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লই; তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে একমনা হইয়া, স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিয়া, ঊর্দ্ধমুখে—তাঁহার সিংহাসনাভিমুখে অটল ভাবে চলিতে থাক, তোমাদের মধ্যে সকল বিবাদ কলহ তিরোহিত হউক, শান্তি-সুখ বিস্তার হউক। তোমাদের ধর্ম্মেতে মতি হউক, ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া তোমাদের হৃদয় নিষ্পাপ ও পবিত্র হউক। তোমাদের প্রতি পরিবার ধর্ম্মের পরিবার হউক, তোমাদের কুলে যেন কেহ অব্রাহ্ম না হয়। তোমরা সকলে ব্রহ্মবান্ ও ব্রহ্মবতী হও। এই সভাস্থ প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হউক, এই আমার স্নেহপূর্ণ শেষ আশীর্ব্বাদ।

সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের অভিনন্দন পত্র।

ওঁ তৎসৎ।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

দেব!

আমাদের প্রিয়তম মাঘোৎসবে আমরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের সভ্যগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন স্বরূপ এই যৎসামান্য প্রীতি-উপহার লইয়া আপনার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতেছি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নহে, এবং যে সময়ে আপনি ব্রাহ্ম সমাজের বেদিকে অলঙ্কৃত করিয়া আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলন্ত ও জীবন্ত সত্য সকল বর্ষণ করিতেন যদিও আমরা তৎপরকালবর্ত্তী বলিয়া সেই উপদেশ শ্রবনে সুখসম্ভোগ করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা সকলেই বহু দিন হইতে আপনার নাম হৃদয়ের নিভৃত স্থলে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছি, এবং অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের খনির স্বরূপ আপনার ব্যাখ্যান মালা পাঠ করিয়া আমরা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি ও অদ্যাপি করিতেছি। আপনি নিজ জীবনে যে প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও সত্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা দুর্ব্বল শক্তিতে যথাসাধ্য সেই পদবীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশেরই পঠদ্দশা। ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা, শিক্ষাকে ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করা, যুবকদিগের মনে কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করা, তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির সুনিয়মে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করা, ছাত্র সমাজের লক্ষ্য।

আমাদের এই ছাত্র সমাজকে আপনার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যের উত্তরাধিকারী বলিলেও হয়। আমরা অদ্যকার এই বিশেষ দিনে আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আপনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ আপনার পদ-চিহ্নের অনুবর্ত্তী হইতে পারে, যেন আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে সত্যস্বরূপে উপনীত করিতে পারে, যেন জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা ধর্ম্মের মহিমা অনুভব করি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-সেবাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি। ইতি।

ব্রাহ্মাব্দ ৫৮।
১৭ মাঘ, কলিকাতা।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
ছাত্র সমাজের সভ্যগণ।

প্রত্যুত্তর।

ওঁ তৎসৎ।

স্নেহাস্পদ ছাত্র সমাজের সভ্যগণ
সমীপেষু।

প্রিয়দর্শন!

আমার প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির উপহার আমি আদরের সহিত, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। তোমরা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র কর এবং তাহাতে যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতে থাক, কালে তাহাতে যে ফল ফলিবে সে ফল হইতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবে; তোমরা যাহা কিছু শিখিবে তাহা প্রমাদ শূন্য হইবে। তোমরা ঈশ্বরের পথে যতটুকু অগ্রসর হইবে যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিবে। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের মহিমা

অনুভব কর এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর প্রীতি ঈশ্বর সেবাতে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমাদের ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হইবে। যেথানে থাক, তোমাদের শরীর মন আত্মা কুশলে থাকুক এই আমার আশীর্ব্বাদ।

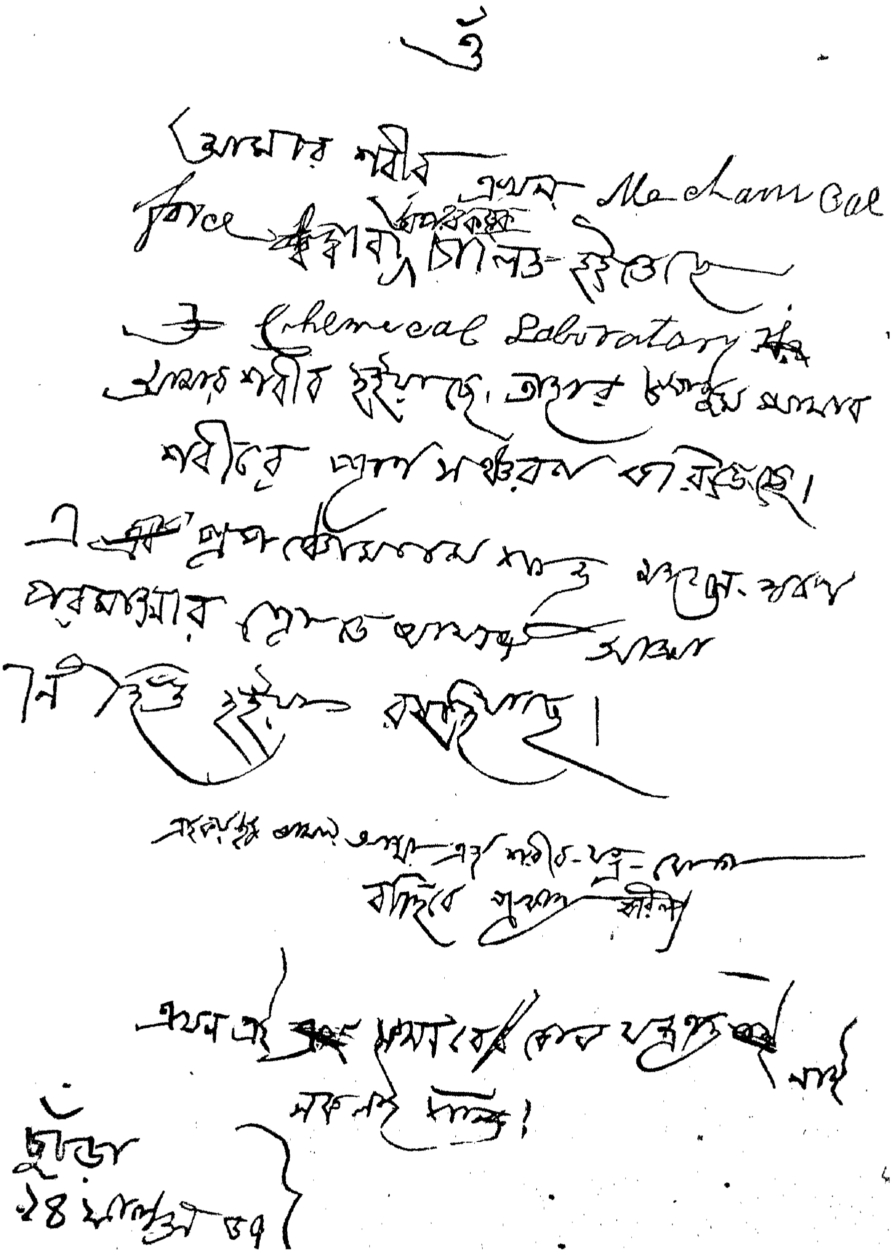
এই সকল অভিনন্দন ও প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইলে পর মহর্ষি প্রদত্ত এক সুদীর্ঘ উপদেশ পঠিত হইল। সেই উপদেশ মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আছে। এই গ্রন্থের নাম "উপহার"।

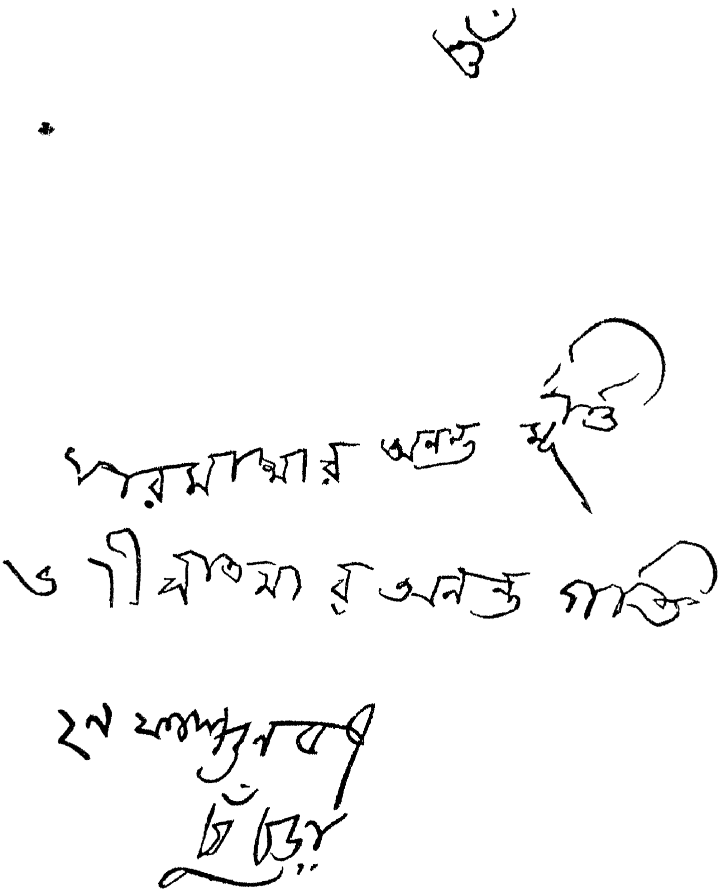
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অভিনন্দন গ্রহণ ও উপদেশ প্রদানে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের শরীরে ও মনে যে শ্রম ও উত্তেজনা হইল, তাহার জন্য মহর্ষির জ্বর হইল। তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। প্রথম প্রথম চুঁচড়ার ভাল ডাক্তার দ্বারা তিনি চিকিৎসিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। জ্বর ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কলিকাতার প্রাচীন ও বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলমাধব হালদার আগমন করিলেন। পরীক্ষা দ্বারা রোগের অবস্থা বুঝিয়া তিনি লেখককে বলিলেন, "death commences, আর সাত দিন পরে ইহার মৃত্যু হইবে।" কলিকাতার ডাক্তার সণ্ডার্স সাহেব ও নীল মাধব হালদার একত্রে মহর্ষির চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সাত দিন পরে মহর্ষির দেহান্ত হইল না, কিন্তু তিনি আরোগ্য লাভও করিলেন না। জ্বরের উত্তাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রী, আহার বন্ধ, হস্ত পদ শুষ্ক ও জীর্ণ। উত্থান শক্তি বিরহিত মহর্ষি শয্যায় শায়িত রহিলেন। মধ্যে মধ্যে উদরাময় হইতে লাগিল। দুর্ব্বলতার জন্য বাক্য অসাড় হইল এবং তাঁহার সমীপে লোক সমাগম নিবারিত হইল। এই অবস্থায় এক দিন প্রভাত সময়ে নিকটে বসিয়া আছি, মহর্ষি বলিতে লাগিলেন—**"ওইটা," "ওইটা।"** বলিলাম, কোন্‌টা? বলিলেন **"ঐ যে—"ধাম্না;—ধাম্না স্বেন সদা।"** বলিলাম সে কি? বলিলেন,—**"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং।"** বলিলাম তাহা কোথায়? মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভাগবতের প্রথম শ্লোক খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া এখনি আমাকে দাও, আমি তাহা পড়িব।" ভাগবতও কাছে নাই, ছাপাখানা কোথায় আছে তাহাও জানি না। আমি তখনই কলিকাতার আদিব্রাহ্মসমাজে যাইয়া খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া অপরাহ্ণে তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ। তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

কয়েক দিন পরে জ্বরের মাত্রা কিছু কম হইল। একদা মুক্ত-দ্বার-গৃহে কৌচে শুইয়া আছেন। বলিলেন, "দোয়াত, কলম, কাগচ দাও,"। আনিয়া দিলাম। তিনি সেই কাগচে লিখিলেন—





মহর্ষির শুশ্রূষার জন্য দিন রাত্রি আমাদিগকে তাঁহার সমীপে থাকিতে হইত। রাত্রিকালে বিছানাতে মশারির মধ্যে আলোক লইয়া যাওয়া হইত। এক দিন পরিশ্রান্ত হইয়া রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য শয়ন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছি। রাত্রি প্রায় একটার সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কর্ত্তার বিছানায় আগুন লাগিয়াছে।" তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া দেখি বিছানা পুড়িয়া গিয়াছে, মশারি পুড়িয়া তাহার অবলম্বন ছাতের কড়িকাষ্ঠে আগুন ঝুলিতেছে, মহর্ষি গৃহান্তরে নীত হইয়া শায়িত রহিয়াছেন। মহর্ষির সেবাপরায়ণ সুযোগ্য জামাতা শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষাল এই বিপদ সময়ে দৈববলে

মহর্ষিকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঈশ্বরের পালনী শক্তি এই ঘোর বিপত্তি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিল।

কয়েক দিন পরে জ্বরের মাত্রা পুনরায় বাড়িয়া উঠিল। এক দিন তিনি প্রাতঃকাল হইতে অচেতন হইয়া রহিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে একটি কথা নাই, পার্শ্বপরিবর্ত্তন নাই। একটু দুগ্ধ বা একটু জল খাওয়াইতে পারা গেল না। অপরাহ্ণে তুলা ভিজাইয়া একটু দুগ্ধ উদরস্থ করাইবার ভূয়োভূয় চেষ্টা করাতে একবার এই মাত্র বলিলেন—"আমাকে আর ক্লেশ দিও না।" মহর্ষি আর বাঁচিলেন না ভাবিয়া আমরা সকলে শোকাভিভূত হইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার পরে হুগলীর তখনকার সিবিল সার্জ্জন জুবার্ট সাহেব আসিলেন। তিনি মহর্ষির অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে, রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির জীবনের অবসান হইবে। মহর্ষির পরিবারস্থ উপস্থিত সকলকে তিনি অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং মানুষের মৃত্যুতে শোক করা যে বিফল তাহা উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া চলিয়া গেলেন। সে রাত্রি এবং তৎপর রাত্রিও কাটিয়া প্রভাত হইল। দেখি যে, মহর্ষি বিছানাতে বালিশ ঠেশ দিয়া বসিয়াছেন। নিকটে গেলাম। বলিলেন,—"**এ কি শুনিলাম! ঈশ্বরের আদেশ! ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে তোমার গম্যস্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে, তখন তোমাকে তোমার গম্যস্থানে লইয়া যাইব।**" মহর্ষিকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে ঈশ্বরের এই আদেশ শুনিয়া হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, মনে সাহস ও ভরসা হইল। বলিলাম যে, দেওঘর হইতে রাজ নারায়ণ বাবু আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিতে দিই নাই। তিনি বলিলেন, "রাজ নারায়ণ বাবুকে আসিতে দাও নাই কেন? তাঁহাকে ডাক।" আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু

মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলাম। মহর্ষি তাঁহাকে নিজের বিছানাতে বসাইয়া এক ঘণ্টা গল্প করিলেন।

রাজ নারায়ণ বাবু মহর্ষিকে দেখিয়া গিয়া দেওঘর হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেম চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

পত্র।

দেবগৃহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ ৫৮।

পরম সুহৃদ্বরেষু।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার।

আপনার ২৪ জ্যৈষ্ঠের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের পীড়ার সময় আপনি যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত যাহা দিয়াছেন তাহা অতি কৌতূহলাবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলাম। আপনি ৮ ফাল্গুন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমি এক সপ্তাহ পরে এখান হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমি যখন চুচুঁড়ায় পৌঁছিলাম তখন দেখি বিষাদ সকলের মুখ মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ও সমস্ত বাটীতে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। আমি যে দিন পৌঁছিলাম শ্রীমতের পীড়া সেই দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম তাঁহার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া হুগলীর সিবিল সার্জ্জনকে ডাকা হইয়াছে। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন তিনি আসিয়া পোঁছেন নাই। ক্ষণেক পরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি শনিবার দিবস চুঁচুড়ায় পৌঁছি। শ্রীমৎ রবিবার ও সোমবার দিবস অচেতন প্রায় ছিলেন। কেবল যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার নিকট যাইতেছে না। মঙ্গলবার দিবস চৈতন্য লাভ করিয়াই আমাকে উপরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি সসম্ভ্রমে দূরে বসিলাম কিন্তু তিনি যে খাটে শুইয়াছিলেন তাহার উপরে আসিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টি স্বভাবতঃ অতি ক্ষীণ। আমি কিঞ্চিৎ

দূর হইতেও ভাল দেখিতে পাই না। খাটের উপর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া যখন তাঁহার শরীরের ভয়ানক শীর্ণতা অনুভব করিলাম তখন আমি আঁতকিয়া উঠিলাম। হায়! হায়! বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রক্ষিত সেই মধুর কান্তি ও লাবণ্য এক্ষণে কোথায়? সে সময় একটি আর্ত্তনাদ অবশ্য আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইত কিন্তু কোনপ্রকার অস্থিরতা দ্বারা তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে ডাক্তারের নিষেধ স্মরণ হইল আর আমি সামলাইয়া গেলাম। যিনি আমাকে উপরে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন তাঁহাকে যাইবার সময় আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম যে যতদূর পারি সুস্থিরতা রক্ষা করিব। খাটের উপর যাইবা মাত্র শ্রীমৎ আমার হাত তাঁহার হাতের ভিতর রাখিতে বলিলেন। আমার হাত ধারণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে আমি এক্ষণে "দৃষ্টিহীন, নাড়ি ক্ষীণ" দিবারাত্রের গতি অনুভব করিতে পারি না— "ন দিবা ন রাত্রিঃ শিবএব কেবলঃ"। আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি। এই কথা বলাতে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। তাঁহার প্রিয়তমের স্মরণে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। অন্তিম সময়ে সেই প্রিয়তমই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। বিদায় হইবার সময়ে তাঁহার পদধূলি লইলাম। সেই সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনীয় নহে। যখন মনে করিলাম যে হয়তো তাঁহার সহিত আর ইহলোকে সাক্ষাৎ হইবে না—তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। অগ্নিময় মস্তিষ্ক লইয়া নীচে আসিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায়! হায়! এ জীবনের guide, Philosopher and friend "পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা ও সুহৃৎ" চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীমৎ উপরে বর্ণিত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ সুদরাইলে পর (তখনও জীবনের বিশেষ আশা নাই) পণ্ডিত প্রিয় নাথ শাস্ত্রী এক দিন তাঁহার হাতের একটি লেখা আমাকে দেখিতে দিলেন। হস্তাক্ষর কিছু অস্পষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এরূপ অবস্থাতে আদোবে লিখিতে পারেন তাহা আমি স্বপ্নে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তলিপি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম আর তাহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহা দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইলাম। উহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল "আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্তৃক যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে

তাহা এক্ষণে সকলপ্রকার রাসায়নিক পদার্থাগার হইয়াছে। আমার আত্মা এক্ষণে সেই শান্তং শিবমদ্বৈতংএর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সংসারে কোন কষ্ট নাই, কোন শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি।" আমি এই লেখা পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম যে শ্রীমৎকে বলিবেন যে এ অবস্থাতে তাঁহার মনের শক্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। ইতি

শ্রীরাজ নারায়ণ বসু।

ক্রমে ক্রমে মহর্ষি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। এবং এত টুকু বল পাইলেন যে, তাঁহাকে এখন কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। সার মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয় স্বীয় ষ্টীমার পাঠাইলেন এবং তাঁহার চৌরাঙ্গীস্থ বাটীতে মহর্ষির বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই বাটীতে এক মাস অবস্থান করিয়া তিনি এত টুকু বল পাইলেন যে, দুই জন মানুষের স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে পারেন। কিন্তু এই দীর্ঘকাল রোগ ও দুর্ব্বলতা জনিত তাঁহার চর্ম্ম-গ্রন্থি সকল এত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার আর এক শারীরিক উপদ্রব উপস্থিত হইল। সে উপদ্রব বৃহদন্ত্র বৃদ্ধির পীড়া। তথাপি তাঁহার মনের ভাব সতেজ ও সবল হইতে লাগিল। পর্ব্বত ভ্রমণের ইচ্ছা আবার জাগিয়া উঠিল। বলিলেন যে, "আমি আর এই কলিকাতার বদ্ধ বায়ু ও অমুক্ত আকাশের মধ্যে থাকিতে পারি না। আমি দার্জ্জিলিং যাইব।" সে কি? যিনি এত দুর্ব্বল যে দুই জন মানুষকে না ধরিয়া এক পা বাড়াইতে পারেন না, তিনি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, রেলগাড়ির প্রবল গতির দ্বারা চালিত হইয়া, প্রবল নদী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুদূর পর্ব্বতে আরোহণ করিবেন! তাঁহার মনের গতি কেহ নিবারণ করিতে পারিল না। টেলিগ্রাফের সংবাদে দার্জ্জিলিঙে বাসস্থান নিরূপিত হইল। পর দিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন এবং সকল সঙ্কট অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই পথে লেখক একমাত্র তাঁহার শরীরের প্রহরীরূপে সঙ্গে ছিলেন। যখন সন্ধ্যার সময়ে রেলগাড়ির সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া সকলে তাঁহাকে গাড়ির ভিতরে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া চলিয়া গেলেন ও দ্রুতবেগে রেলের গাড়ি উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল, তখন পদ্মা নদীর

সুবিশাল বালুকা চর আমার স্মরণ হইয়া আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যথন উষার পূর্ব্বে রেলের গাড়ি সেই প্লাটফরমবিহীন বালুকাস্তূপের উপরে গিয়া দাঁড়াইবে ও লোকেরা লম্ফে ঝম্ফে পড়িয়া দৌড়াদৌড়ি ষ্টীমারে উঠিবে, তথন আমি এই রুগ্ন মহাপুরুষকে লইয়া কি প্রকারে নামাইব, জাহাজে উঠিব, ও পরপারবর্ত্তী গাড়িতে সযত্নে তাঁহাকে শয়ন করাইব, ইহাই ভাবনা। কিন্তু "য এষ সুপ্তেষু জগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমানঃ" তিনিই এই মহাপুরুষের সঙ্কট নিবারণের উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যথন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিশেষে দামুকদেয়াড়ের বালু-ভূমিতে গাড়ি দাঁড়াইল, আমি অনন্যোপায় হইয়া সাহায্যার্থে আকাশে আহ্বান করিলাম। কোথা হইতে কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্র যুবক আসিয়া দেখা দিলেন এবং তাঁহাদের সাহেবের ব্যবহার্য্য একখানি প্রশস্ত সোফা আনিয়া মহর্ষিকে তাহাতে বহন পূর্ব্বক জাহাজে, তদনন্তর পরপারবর্ত্তী রেলের গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি এ রহস্য বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

কথা ছিল যে, মহর্ষি দার্জ্জিলিং পঁহুছিলে তাঁহার কোন কোন কন্যা ও জামাতা তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার নিকট যাইবেন। কিন্তু এই মুমূর্ষু অবস্থাতেও মহর্ষি কিরূপ সেবা, কিরূপ সঙ্গ ও কিরূপ আরাম বাঞ্ছা করেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র ও একটি উক্তিদ্বারা প্রতীয়মান হইবে।

পত্র।

প্রাণাধিক——

আমি এই জরাজীর্ণ শরীর লইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই পৃথিবীতে আর অতি অল্প দিনই আছি। আমার এথানকার দিনের প্রায় অবসান হইয়াছে। এবং এখান হইতেই আমার নবতর কল্যানতর দিনের অভ্যুদয় দেখিতেছি। এখন আমার সম্যকরূপে যতির ধর্ম্ম পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব পরিজনের সঙ্গ হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া একান্তে নির্জ্জনে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। পরিজনের সঙ্গ চিত্তকে যোগে সমাহিত করিবার অন্তরায়। সহজেই সংসারের ধূলি আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও কলুষিত করে। এই ক্ষণে এই ভগবদ্গীতার শ্লোকের অনুসরণ করিয়া আমাকে অবস্থান করিতে হইবে—

"যোগী যুঞ্জীত সততং একান্তে রহসিস্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥"

অতএব তোমরা এখন এখানে আসিতে ক্ষান্ত থাকিয়া আমার এই যোগের আনুকূল্য করিলে পরম সন্তোষ লাভ করিব। তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল হউক এই আমার শুভ আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৬ বৈশাখ ৫৮ ব্রাঃ সম্বৎ।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
দার্জ্জিলিং।

উক্তি।

এখন নীড়ে মাতার পাখার নীচে শুইয়া রহিয়াছি। শীঘ্রই আমার পাখা উঠিবে তখন মাতার সঙ্গে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইব। এ আনন্দ আর আমার মনে ধরে না।

দার্জ্জিলিং।
১৬ জ্যৈষ্ঠ ৫৮।

দার্জ্জিলিঙের অতিবৃষ্টি ও মেঘ কুজ্ঝটিকাসিক্ত বায়ু মহর্ষির এই জীর্ণ শরীরে সহ্য হইবে কেন? তাঁহার কাশি হইল এবং তাহার বেগে অন্ত্রের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার অধিকাধিক ক্লেশ হইতে লাগিল। ডাক্তারেরা আর কিছুতেই তাঁহাকে এই স্থানে থাকিবার পরামর্শ দিলেন না। তিন মাস পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন কিন্তু কলিকাতার নিজ বাটীতে তিনি আর পদার্পণ করিলেন না। স্রষ্টার আদেশে এখন হইতে তাঁহাকে যে সম্যক্‌রূপে যতির ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, তাঁহার গম্য স্থান মুক্তির জন্য তাঁহাকে যে প্রস্তুত হইতে হইবে, নির্জ্জনে পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে, অতএব কলিকাতার পার্কষ্ট্রীটে নির্জ্জনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সমাধি যোগে তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন।

বঙ্গের মহিমান্বিত, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সদাচারে সমুন্নত শ্রীমন্মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর শ্রীমন্মহর্ষির অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধাবান্ ভ্রাতা। এক দিন তাঁহাকে

দেখিবার জন্য মহর্ষি গাড়িতে চড়িয়া পাথুরিয়া ঘাটায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। পথ পার্শ্বে মহর্ষির বাড়ী। গমন ও প্রত্যাগমন কালে মহর্ষিকে বলিলাম, এই আপনার বাড়ী। সকলের ইচ্ছা যে আপনি এক বার বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, "আমি যখন গৃহ একবার পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর তথায় প্রবেশ করিব না।"

মহর্ষি এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত নিষ্কাম-কর্ম্মী, নির্লিপ্ত সংসারী, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, কিন্তু যে দিন হইতে তিনি সম্যক্‌রূপে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন সে দিন হইতে তিনি গ্রামে থাকিয়া অরণ্যবাসী হইলেন। এ কথায় মহাভারতের এই মহদুক্তির ভাব বুঝিতে হইবে।

অরণ্যে বসতো যস্য গ্রামোভবতি পৃষ্ঠতঃ।
গ্রামে বা বসতোঽরণ্যং সমুনিস্যাজ্জনাধিপঃ ॥

এই মুনি ভাবাপন্ন অবস্থাতেও মহর্ষি চারিটি প্রধান কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইটি অমূল্য উপদেশ। তাহা মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম "জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি" এবং দ্বিতীয়টির নাম "পরলোক ও মুক্তি"। এই পরলোক ও মুক্তির বিষয় তাঁহার নিজকৃত জীবন-চরিতের মধ্যগত পরলোক ও মুক্তি বিষয়ক প্রস্তাবেরই কিছু বিশেষ বিস্তার। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে "সঞ্জীবনী" ও "Calcutta Review" নামক সংবাদ পত্রদ্বয়ের অভিমত আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

সঞ্জীবনী বলেন,—* * * * বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় শিথিলতা আসিয়া পড়িয়াছে এবং জগৎ-স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার মারাত্মক মত তাহাদিগের কর্ত্তৃক পরি-পোষিত হওয়াতে আমাদিগের জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া দিতেছে। এই শোচনীয় বিষয় লক্ষ্য করিয়া অন্য দেশীয় এক জন কৃতবিদ্য প্রাচীন শিক্ষক একদা সভাস্থলে বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলেন— "Knowledge without virtue is like a beauty without shame. A learned but vicious man proves as great a nuisance of the society as a handsome woman without chastity" অর্থাৎ ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত জ্ঞান লজ্জা বিবর্জ্জিত সৌন্দর্য্যের তুল্য। এক জন ধর্ম্মহীন জ্ঞানী

ব্যক্তি, চরিত্র বিহীন সুন্দরী স্ত্রীলোকের ন্যায় সমাজের অপকার করিয়া থাকে। তাঁহার বাক্য যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। জ্ঞানোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য বিষয়ে এক্ষণে প্রায় সকলই অন্ধ। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া নৈতিক জীবন গঠন বিষয়ে এক্ষণে অনেকেই মনোযোগ দেন না। এইরূপ সময় পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রদত্ত এই সারবান ও বহুমূল্য উপদেশ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা যারপর নাই আশান্বিত হইয়াছি। তিনি অতি সরল ভাবে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান সময়ে মহা উপকার সাধিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া পাশ্চাত্য বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাপূর্ণ যে সকল বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা আলোচ্য বিষয়টীকে অতি জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশল দেখাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তি দৃঢ় করিতে যেমন বহু প্রয়াস পাইয়াছেন, আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষি উপদেশচ্ছলে অতি সরল-ভাবে সেই সকল বিষয় চুম্বকাকারে আলোচনা করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত করুণা ও অনন্ত জ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া অনেক সংশয়বাদী-দিগের ভ্রম অপনোদন করিয়াছেন।

"মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার" বিষয় লিখিতে গিয়া ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিস হইতে অদ্যাবধি নানা পণ্ডিতের মত এক বৃহৎ ইতিহাসাকারে সংগ্রহ করিয়া তৎপরে সেই বিষয় মীমাংসা করিয়া-ছেন; তদ্দ্বারা বিষয়টী এরূপ দুরুহ হইয়াছে যে তাহা পাঠে সন্দেহ দূর হওয়া দূরে থাকুক আরও নানা সন্দেহ মনে উদিত হয়। কিন্তু মহর্ষি ধর্ম্ম জগতের এই একটী অত্যাবশ্যকীয় ও গূঢ় প্রশ্ন অতি সুন্দর ভাবে সংক্ষেপে বেশ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই সকল বিষয় এরূপ গভীর বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছেন যে তাহার প্রতিবাক্য সন্দেহ দূর করিয়া দিয়া জ্বলন্ত বিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রীতি মনেতে জন্মাইয়া দেয়। ইহাই এই পুস্তকের মৌলিকত্ব।

আদিম আর্য্যজাতিগণ ভারতবর্ষ কি প্রকারে অধিকার করিল, কি প্রকারে তাহারা এই দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, কি প্রকারে তাহাদের

মধ্যে জ্ঞানজ্যোতি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে উন্নত হইতে উন্নততর করিয়াছিল এবং পরম পিতার শুভ ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে স্পষ্টরূপে কার্য্য করিয়া কি প্রকারে তাহাদিগকে ধর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল এই সকল সত্য মহর্ষি অতি বিশদ ও সুব্যক্তরূপে দেখাইয়াছেন। সেই পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বর করুণা অজস্র শ্রোতে প্রবাহিত হইয়া আর্য্যজাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারময় অবস্থা হইতে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অভাব হইতে ক্রমশঃ উত্তোলন করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সভ্যতার দ্বারা ভূষিত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিলেন—তাহাও উপদেশ পাঠে যত হৃদয়ঙ্গম হয় ততই সংশয় ও অবিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ের কাঠিন্য দূর হইয়া মনে গভীর বিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রীতির ভাব উত্থিত হয়।

তাঁহার আদিম আর্য্যজাতি বিষয়ক উপদেশ সকল পাঠ করিয়া আমরা আর একটী বিষয় জানিতে পারি—বেদের উপর নির্ভর করিয়া আদিম আর্য্যজাতির ইতিহাস প্রণয়ন করিতে পারা যায়। তাঁহাদের সামাজিক নৈতিক মানসিক ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিবরণ যে বেদপাঠে বেশ জানা যাইতে পারে, তাহা মহর্ষি উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। আদিম আর্য্যজাতির ইতিহাসের উপকরণ বেদে প্রভূত পরিমাণে আছে।

জ্ঞানের উন্নতির সহিত ধর্ম্মের উন্নতি হইবে, ইহাই ঈশ্বর অভিপ্রেত। ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ দ্বারা মনুষ্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে ইহাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী মহর্ষির এই অমূল্য উপদেশ সকল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই পুস্তক একখানি অমূল্য গ্রন্থ। তাঁহার ব্যাখ্যানের পর, অনেক দিন আমরা এইরূপ গ্রন্থ দেখি নাই। আমরা বঙ্গদেশীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই এই পুস্তক একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। নিরপেক্ষভাবে লিখিত এই পুস্তক যে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিবে, তাহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

"জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" আমাদের কেন প্রিয় হইবে, তাহার দুই কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহার জ্ঞানগর্ভ ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ সকল। দ্বিতীয়তঃ ইহা আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের ধর্ম্মজীবনের শেষ বাক্য। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য ঋষিদের অমূল্য বাক্য সকল যেমন আমাদের হৃদয়ের ধন, আশা করি, মহর্ষি দেবের এই অমূল্য উপদেশ সকল সেইরূপ হইবে।

বহুকাল পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান প্রকাশিত করিয়া বিপথগামী বহু লোককে ধর্ম্মপথে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং এক্ষণে সেই পথগামী স্থপর লোকদিগের অন্ধ নয়ন জ্যোতিষ্মান করিবার জন্য তাঁহার "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" প্রকাশিত করিলেন। প্রথমটী আমাদের ধর্ম্মপথে যষ্টিস্বরূপ ও দ্বিতীয়টী আলোকস্বরূপ হইবে। তাঁহার নিকট আমরা কত-দূর ঋণী তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

Calcutta Review পত্রিকার মত—This book is a collection of sermons by the venerable patriarch of the Theistic Church in India, known as the Brahmo Samaj. Maharshi Debendra Nath Tagore, who is now far advanced beyond his grand climacteric, and has devoted his whole life to the cultivation of his naturally strong and vivid religious instincts, commands the deepest reverence and confidence of many of his countrymen as a religious leader. He is looked upon as an individual whose whole career has been a bright example of a God-devotedness, deep, fervent, sincere and steady, comparatable only to that believed to have been possessed by the *Rishis* of Ancient India. It is no wonder then that his admirers have for a long time delighted to call him a *Maharshi*, or a great *Rishi*.

The book under notice is devoted partly to illustrating the gradual steps by which the Indo-Aryans attained, with the progress of general knowledge among them, to a high conception of God and of the duties of man, and partly to elucidating the contention that the discoveries of modern Science only serve to strengthen the intuitive belief of man in the existence of a Supreme Soul of the Universe. What strikes one most in the book is the spirit of fervent religiousness which glows in every page, and which cannot fail to exercise

a sanctifying influence on the reader's mind making him feel a better man and empowering him to get a glimpse, as it were, of a high and pure state of spiritual enlightenment and felicity. One of the great ideas which the work is calculated to instil into the mind of a reflective reader is that God is both Law and Love; an idea which is in perfect harmony with the most enlightened religious thought of the day, and which has found beautiful expression in the following well-known lines of Tennyson:

> "God is law, say the wise, O soul, and let us rejoice;
> For if He thunder by law, the thunder is yet His voice.
> Speak to Him, then, for He hears, and spirit with spirit may meet.
> Closer is He than breathing, and nearer than hands and feet."

We highly commend *Jnân O Dharmer Unnati* to all who find solace in that high order of religious thought, which is untarnished by dogmas, unperverted by bigotry, and unadulterated by the subtle quibbles of metaphysical sophistry.

মহর্ষির অপর দুইটি কার্য্যের মধ্যে একটি দান ও অন্যটি বিষয়-ব্যবস্থা। পূর্ব্বে আমরা যে শান্তিনিকেতনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, যে নির্জ্জন স্থান শ্রীমন্মহর্ষির সাধনস্থান ছিল, যেখানে বহুবার কালাতিপাত করিয়া ও সাধন করিয়া স্বীয় অধিষ্ঠানে যাহাকে তিনি পবিত্র করিয়াছেন, সেই মনোরম পবিত্র স্থানকে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু লোকদিগের আশ্রয়-ভূমি করিবার উদ্দেশে ১৮০৯ শকের ২৬ ফাল্গুন দিবসে তাহা তিন জন বিশ্বস্ত অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন। এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক ১৫০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়াছেন। এখানে নিত্য ব্রহ্মোপাসনার জন্য বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটি সুন্দর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে নিজ হৃদয়ের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সেই মন্দিরের ঊর্দ্ধদেশে আকাশমার্গে স্বর্ণাক্ষরে "ওঁ" এই শব্দ অঙ্কিত করিয়া মন্দিরের চূড়ায় উত্তোলন করিয়া দিয়াছেন। মুক্তি

সম্বন্ধে তাঁহার পরলোক ও মুক্তিবিষয়ক প্রবন্ধের শেষে যে শ্রুতি আছে তাহা উৎকৃষ্ট প্রস্তরে খোদিত করিয়া মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভোপরি স্থাপিত করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন উদ্যানের এক দ্বারে "ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ" ও অন্য দ্বারে ঈশ্বরের স্বরূপ বিজ্ঞাপক বৈদিক মন্ত্র ও উদ্যান প্রাঙ্গনে যথা তথা শ্রুতি ও সঙ্গীতাংশ সকল খোদিত করিয়া রাখাইয়াছেন। এখন ব্রহ্ম সন্তান সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সাংসারিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া মনের শান্তি হারাইয়াছেন তাঁহারা সেখানে গিয়া শান্তি লাভ করেন। তথায় যাইলে জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারা যায়। যিনি সংশয়ীধর্ম্মবাদ তাঁহার সংশয় দূর হয়, যিনি আরুরুক্ষু তিনি ধর্ম্মের সোপান লাভ করেন, যিনি প্রেমিক তিনি হৃদয়োন্মাদকর সৎ কথা শ্রবণ করেন এবং যিনি সজ্জন ভক্ত তাঁহার আশা চরিতার্থ হয়।

বিষয়-ব্যবস্থা—তিনি শরীরের এই অতি জীর্ণাবস্থাতে তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপন ভ্রাতুষ্পৌত্র ও পুত্রদিগকে উপযুক্তরূপে সকলের সন্তোষে বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে তাহার বাহিরে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা রূপে ঈশ্বরের সহিত সমাহিত হইয়া শেষ জীবন কাটাইয়াছিলেন।

জন্মতিথির উৎসব।

১৭৬৩ শকের ৩০ ভাদ্র তারিখে মুদ্রিত একখানি পুস্তক আমাদের নিকটে আছে, তাহার নাম "জন্মতিথি নিমিত্তক উপাসনা সভার বক্তৃতা"। ইহা তত্ত্ববোধিনী সভার উৎসব। মহর্ষি এই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। এই সভার বক্তৃতাতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "এই ক্ষণে পরোপকার ব্রতপরায়ণ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় যিনি এই সভার সভাপতিত্ব কর্ম্মের ভার লইয়া স্বীয় শরীরের আয়াস ও অর্থাদি দ্বারা সর্ব্বদা সুনিয়মপূর্ব্বক ইহার তাবৎ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতেছেন এবং যিনি এই সভা ও পাঠশালা স্বয়ং মন হইতে উদয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে এই সভাস্থ সমস্ত সভ্য কর্ত্তৃক ধন্য-বাদ করা অতি উচিত।"

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমি এতদ্রূপ জ্ঞান-তরণির সুচতুর সুবিজ্ঞ কর্ণধার সভাপতিকে সহস্র সহস্র ধন্য ধ্বনি প্রদান না করিয়া ক্ষন্ত হইতে পারি না, যাঁহার উৎসাহ অনুরাগ এবং যত্নেতে এই সভার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই হেতু যখন আমি স্মরণ করি যে যে সভাতে প্রতি মাসে সাধু ব্যক্তিরা একত্রস্থ হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বর প্রতিপাদক উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ঈশ্বর বিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সন্তোষপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং যে সভার গুণরজ্জুতে অনেকে একত্র বদ্ধ থাকিয়া অপরের হিতচেষ্টায় আহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন, সেই সভার যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা আমি আপনার সাধ্যানুসারে করিতেছি তখন যে কি পরমাশ্চর্য্য আনন্দ আমার মানস-মন্দিরে বিরাজমান হয় তাহা মনই বিশেষরূপে জানিতেছে এবং অনুমান হয় এই সভাস্থ সমস্ত মহাশয়েরা সেইরূপ হর্ষকে স্পর্শ করিতেছেন।

"আবার কি আনন্দরাশি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতেছি, নানা-বিধ দেশোপকারের মধ্যে দেশীয় মনুষ্যগণকে বিদ্যা উপদেশ করা যে প্রধান কর্ম্ম তাহা এই সভার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।"

এই অক্ষয় কুমার দত্তের ভাষা ও ভাবের সংস্কারক, আশ্রয় ও উৎসাহদানে তাঁহার যশ প্রখ্যাতির প্রবর্দ্ধক মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ স্বীয় জ্ঞান ও ভাষার স্বাভাবিক স্রোতে বলিয়াছিলেন, "এই সভাতে সংযুক্ত হইয়া সাহায্যদ্বারা এই সভাকে বর্দ্ধিনী করিলে পরের উপকারের সহিত আপনারও উপকার হইবে। পিতা মাতার কি দুঃখ যখন স্নেহের পাত্র বিধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের শত্রুর আশ্রয়ে বাস করে। তখন পিতা মাতার কি দুঃখ হয় যখন দেখেন যে স্নেহের সন্তান স্বধর্ম্ম পক্ষ হইতে ত্যক্ত হইয়া অতি হীন লোকের সেবার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া কোন প্রকারে কাল যাপন করিতেছে, স্ববন্ধু বান্ধব দ্বারা ঘৃণিত হইতেছে এবং নীচ লোকের দ্বারা সর্ব্বদা অপমানিত হইতেছে। তখন কি তাঁহারা এমন মনে করেন না যে এমন পুত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের মঙ্গল হইত? অতএব যাঁহারা পুত্রের শারীরিক রোগ হইতে রক্ষার নিমিত্তে বৈদ্যকে বেতন দেন, তাঁহারদিগের উচিত যে তাঁহাদিগের বালককে মান-

সিক পীড়া হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে এই সভার সাহায্য যত্নপূর্ব্বক করেন। এই সকল পরম হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত এই তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, অতএব পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি এই তত্ত্ব-বোধিনী সভা চিরস্থায়িনী করিয়া স্বদেশের বন্ধুদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করুন এবং এই সভার অধ্যক্ষ সম্পাদক ও সভ্যসমূহের ধন্যবাদ যোগ্য পরিশ্রমকে সফল করুন।”

মহর্ষি যৌবনোন্মুখে তত্ত্ববোধিনী সভার উৎসব করিতেন। এক্ষণে তাঁহার জীর্ণাবস্থায় যখন তিনি তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক কেবল সমাধানে নিযুক্ত রহিলেন তখন হইতে তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার নিজের জন্মতিথির উৎসব বৎসরে বৎসরে করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে তাঁহার এক অনুগত শিষ্য, বাঙ্গালা দেশের সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ এবং নববিধান ব্রাহ্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক যে তিনটি অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা আমরা যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

ওঁ

জয়মালা।

অষ্টমীর চন্দ্র অস্ত গেলে মধ্য যামে
শেষার্দ্ধ রজনী যথা আঁধারে ব্যাপিত
হয়েছিল অন্ধ ঘোর এ ভারত ভূমি
প্রাচীন বৈদিক জ্যোতি হলে অস্তমিত।

চাঁদের কিরণাভাব করিতে বিদূর
সারাদিন ভাতে যথা রবি ভ্রাজমান,
সেইরূপ অস্তমিত আর্য্যজ্যোতি স্থানে
হে গুরো, দেবেন্দ্র, দেব, তুমি জ্যোতিষ্মান্।

ত্যজি স্বর্গ মহাপুরী, বিধির আদেশে,
এসেছ মরতে গূঢ় লক্ষ্য সাধিবারে—

সাধিত সাধনা-শিক্ষা, নিষ্কাম সংসার,
উদ্ধারিলে মগ্নজনে কল্পনা পাথারে।

যে মহা অমৃত তুমি মানবের হিতে
উদ্ধারিলে বেদার্ণব করিয়া মন্থন,
শ্রদ্ধায় যে জন তাহা করিবেক পান,
অনন্ত কালের গর্ভে অমর সে জন।

দৃশ্য-পট মাঝে তুমি শরীরী মানব,
অশরীর স্বর্গবাসী দেবতা অন্তরে,
একাধারে যোগী হ'য়ে ভ্রম যোগপথে
নির্ব্বহ সংসার তস্য প্রিয়কার্য্য তরে।

যে তানে মগন তুমি যাহা কর ভোগ,
অহোরাত্র যে আলো করিছ সন্দীপন
যে আনন্দ বাদ্য গান সুধারাশি ঢালে
তোমার হৃদয়ে, তাহা অপরে গোপন।

ধন্য তুমি আপ্তকাম যোগী আত্মকাম।
তারাও সৌভাগ্যশালী, তোমারে যাহারা
আদর্শ করিয়া চলে মহাধর্ম্ম-পথে,
তোমারে চিনে না যারা হতভাগ্য তারা।

সাধিয়া আপন কার্য্য ঊর্দ্ধমুখী তুমি
বসি আছ বিধাতার আদেশ চাহিয়া,
বিধাতার স্বহস্তের পুরস্কার লোভী
প্রবাস এ পৃথিবীরে পশ্চাতে রাখিয়া।

একোন অশীতি বর্ষ বয়ক্রমে আজ,
হে দেব, করিলে তুমি পুণ্যপদার্পণ,
তাই এই শুভ লগ্নে গাঁথি জয়মালা
এসেছি তোমারে তাহা করিতে অর্পণ।

এই সে জয়ের মালা গাঁথা ভক্তি-ফুলে
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা চন্দনে-চর্চ্চিত,
লহ দেব কৃপা করি, কর আশীর্ব্বাদ,
স্থির থাকি সে পথে যা তব পদাঙ্কিত।

যোগ-সমর্পিত-কর্ম্ম সমাহিত তুমি,
কি আর তোমার তরে যাচিব স্রষ্টারে,
কুশলে উত্তীর্ণ হও, এইমাত্র যাচি,
সকৃৎ প্রভাত-বাসে তমিস্রের পারে।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশয়
ভক্তিভাজনেষু—

প্রণতি পুরঃসর নিবেদন,—

অদ্য ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপনি অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এতদুপলক্ষে আমরা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা কৃতজ্ঞ অন্তরে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি যে, আপনি এই দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনার ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবনকে পোষণ করিতেছেন। প্রথম যৌবনের উদ্যমের কালে যে অনুরাগের সহিত আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এই জরাজীর্ণ দেহেও সেই অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। ইহা স্মরণ করিলে আমাদের চিত্ত সবল হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। আপনি ব্রহ্মোপাসনাকে নিজ জীবনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশকে চিরকৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনার বিশ্বাসের অটলতা, সাধননিষ্ঠা, ধ্যানপরায়ণতা, গভীর জ্ঞানানুরাগ ও কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, চিরদিন আমাদিগের ও আমাদিগের পরবর্ত্তী বংশপরম্পরায় ধর্ম্মপথের আলোকস্বরূপ

হইয়া থাকিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে, আপনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আপনার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদের দ্বারা আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই সামান্য উপহার আমরা অদ্য, আপনার জন্মদিনে, আপনার চরণে অর্পণ করিলাম। নিবেদন ইতি, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮ শকাব্দ।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, আরা,
ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চুঁচুড়া, দিনাজপুর, সিরাজ-
গঞ্জ, পাবনা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের ছয়শতের
অধিক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা।

ভক্ত্যুপহার।

একান্ত ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ধর্ম্মপিতৃ মহোদয়
শ্রীচরণকমলেষু।

'ঈশাবাস্য'মিতি প্রমাণবিষয়ং কর্ত্তুং পরেণাসকৃৎ
সম্পদ্রাশিরহো বিকারজনকো মাভূৎ স্বয়ং তৎকৃতে।
পূর্ব্বং বোধয়তা যএষ কৃপয়াঽস্বাযি প্রকামং পুন-
রার্ষীং যোগগতিং প্রতীতিবিজিতাং প্রাবর্ত্তয়ৎ শস্তমাম্॥

জ্ঞানং শুদ্ধতমং প্রচিত্য নিখিলং বেদান্ত সংসেবিতং
সাক্ষাৎকৃত্য পুনঃ স্বচিত্তনিলয়ে যোগেন তৎ সাম্প্রতম্।
যোগজ্ঞানভৃতং পরেশপরমস্পর্শং সমাসাদ্য চ
প্রেম্ণা পূর্ণতমত্বমাপয়দহো ব্রহ্মাপ্তিজং দর্শনম্॥

ব্রাহ্মাণাং হৃদয়ে স এষ নিতরাং যোগানুরাগং ভৃশং
তস্প্রোদ্দীপয়িতুং হিমালয়সুখং ত্যক্ত্বোর্য্যকার্ষীচ্ছ্রমম্।
স্থানং পিত্রুচিতং প্রকামমধুরঞ্চাপূরয়ন্নদ্য স
বর্ষেঽশীতিতমে পদং শুভতমেঽধাদ্ধর্ষমুৎপাদয়ন্॥

যোগস্পৃহা যত্র হৃদি প্রবর্ত্ততে পশ্যেম তং তত্র হি বর্ত্তমানম্।
দূরান্ন দূরে বয়মস্য চেৎ পুনর্ব্রহ্মান্তরব্যাহতমাপ্নুয়াম॥

অভ্যর্থয়ামো ভবতো নিদর্শনৈর্বিকারজাতং নিতরাং নিরস্যতাম্।
যোগোত্থমালম্ব্য ভবৎপ্রদিষ্টং পন্থানমীশং সমবাপ্নুয়ুস্তে॥

ব্রহ্মানন্দেন পুত্রেণ ভবতো ভ্রাতৃতাং গতাঃ।
বয়ং জন্মদিনে তেন ব্যঞ্জ্মো হর্ষং সমুচ্ছ্রিতম্॥

'সমুদায় ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত' এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য ভগবান কর্ত্তৃক যিনি আহূত হইয়াছেন, এবং সম্পদ্রাশি বিকার জন্মাইতে না পারে এজন্য করুণা সহকারে ভগবান্ পূর্ব্বেই যাঁহাকে সমুচিত উপদেশ দান করিয়াছেন, যিনি মঙ্গলকর ঋষিসমুচিত যোগের গতি আপনি প্রতীতির বিষয় করিয়া উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; বেদান্তসেবিত নিখিল শুদ্ধতম জ্ঞান যিনি (ব্যাখ্যান দ্বারা) পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং যোগদ্বারা সেই জ্ঞান আপনার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যোগ এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট ঈশ্বর-সংস্পর্শ লাভ করিয়া যিনি ব্রহ্মদর্শন প্রেমদ্বারা পূর্ণতম করিয়াছেন, তিনি হিমাচলের সুখ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে যোগানুরাগ উদ্দীপন করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এবং নিরতিশয় মধুর পিতৃসমুচিত স্থান আপূরণ করিয়া অদ্য সকলের হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক শুভতম অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। যে হৃদয়ে যোগের স্পৃহা আছে আমরা সেই হৃদয়ে তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখি। যদি আমাদের হৃদয়ে আমরা অবাধে ব্রহ্মকে লাভ করি, তাহা হইলে তাঁহা হইতে আমরা দূর হইতে দূরে নহি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার জীবনের নিদর্শন যোগোত্থিত সকল প্রকারের বিকার নিরস্ত করুক। আপনি যে পথ উপদেশ করিয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মগণ ঈশ্বর লাভ করুন। আপনার পুত্র ব্রহ্মানন্দের সহিত আমরা

ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ। আমরা আপনার জন্মদিনে তাঁহার সহিত অত্যুচ্ছ্রিত আনন্দ ব্যক্ত করিতেছি।

১৮১৮ শক।
৩রা জ্যৈষ্ঠ।

এক্ষণে আমি মহর্ষির মুখের কতকগুলি অমৃতময় কথা ও তৎকর্ত্তৃক সমাধিযোগে প্রাপ্ত ঈশ্বরের বাণী যাহা তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে বলিয়াছিলেন তাহা পাঠকদিগের নিতান্ত সুখকর হইবে বোধে এখানে প্রকাশ করিতেছি।

মহর্ষির কথা।

১

আমি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। অজ আত্মা অনন্তজ্ঞান পূর্ণ পুরুষ আমার স্রষ্টা পাতা ও প্রতিষ্ঠা। তৎপ্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীৎ মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত মানবান্ ভবতি। তন্নম ইত্যুপাসীত নম্যন্তেহস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি।

এতজ্‌জ্ঞেয়ন্নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। সম্প্রাপ্যৈনং ঋষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্ত কালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

২

তিনি আমার প্রাণারামং মনআনন্দং শান্তি সমৃদ্ধ্যমমৃতমিতি।

৩

অনন্তজ্ঞান মহাপ্রাণ সর্ব্বশক্তি চেতনাবান্। অন্তর্যামী বিশ্বনিকেতন পূর্ণ সত্য পুরুষ মহান্। ধ্রুবং

৪

দর্শনস্য দর্শনেন নো মনোহ নির্ম্মলং ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার অন্তরে আসীন হইয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছেন যে, "২ং ব্রহ্মাস্মীতি" অতএব আমি তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষী। কিন্তু আমি তো আর

চিরদিন এই সাক্ষ্য দিতে বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম। সেই লৌহনির্ম্মিত মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওঙ্কার আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে, "একং ব্রহ্মাস্তীতি"।

৫

দেখিতেছি,

আমার অন্তর্যামী পুরুষ জেগে আছেন, আর তাঁহার আবির্ভাব এই বিশ্বসংসার তাঁর মঙ্গলময়ী ইচ্ছাতে চলিতেছে।

৬

এই অকিঞ্চিৎকর দীনহীনের গৃহে তিনি অনেক দিন অতিথি হইয়া রহিয়াছেন এবং কৃপা করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেছেন, এখন তাঁর নিজের ঘরে যাইবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁর এই মধুর আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া আমার এই ভাঙ্গা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রেমাগারে চলিলাম। সেখান হইতে আর ফিরিব না।

ঈশ্বরের বাণী।

১

আজ আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের এই বাণী আসিয়া পঁহুছিয়াছে—

"যত টুকু আমার কথা শুনিয়া চলিয়াছ, যতটুকু আমার আদেশ পালন করিয়াছ, ততটুকু তোমার জয়লাভ হইয়াছে। এখন সম্যক্‌রূপে আমার কথা শুনিয়া চল, যে এই সংসারের পর পারে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইবে এবং সিদ্ধিলাভ করিবে।"

২৮ ভাদ্র ১৮১৩ শক।

২

"তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিবে এবং নিত্যকাল আমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।"

হা ঈশ্বর! তোমার এ কি করুণা!

১ কার্ত্তিক ১৮১৩ শক।

৩

কল্যকার গভীর নিশীথে আমার ব্যাকুলচিত্তে তাঁর এই অভয় বাণী বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইল—

"ভয় নাই, তোমার এই শরীরের পতন হইলে আমার নিত্য সহবাস লাভ করিবে।"

২০ পৌষ ১৮১৭ শক।

৪

কল্য রাত্রির অবসানে যে আনন্দ লাভ করিলাম তাহা হৃদয়ে ধরে না। আমার প্রাণ যাহা চায় সেই আশ্বাসই তিনি আমার হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন—"তুমি নমস্কারের সহিত আমাতে নিত্যযুক্ত থাকিবে।" ইহাতে আমার প্রেম পূর্ণ হইল।

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮ শক।

যে ক্ষণজন্মা দিব্য পুরুষের স্বরচিত জীবন চরিতের সহিত পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইলাম তিনি কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ও তাঁহার জন্ম ফল কি? পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে তাঁহার জন্মকোষ্ঠী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া এই জীবন চরিত সমাপ্ত করিতেছি।

শুভমস্তু ১৭৩৯।১।২।৫২।৩৮

ব্যক্ত নাম শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা। রাস্যাশ্রিত নাম শ্রীঅন্নদা নাথ দেবশর্ম্মা।

সৌর জ্যৈষ্ঠস্য তৃতীয় দিবসে জীব বাসরেঽমাবাস্যান্তিথৌ নক্তং দ্বিপঞ্চাশৎপলাধিকোনবিংশতি দণ্ড সময়ে শুভ মীন লগ্নে গুরোঃ ক্ষেত্রে চন্দ্রস্য হোরায়াং গুরোর্দ্রেক্কানে বুধস্য নবাংশে শুক্রস্য দ্বাদশাংশে বুধস্য ত্রিংশাংশে তৃতৈস্যব যামার্দ্ধে চ গুরোর্দণ্ডে কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত মেষরাশৌ চন্দ্রে শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ বাবু মহাশয়স্য শুভ প্রথম কুমার জাতবান্।

ক্ষেত্রফল।

জীবস্য ক্ষেত্রে ধনবাংশ্চিরায়ুর্দাতা পবিত্রোগুণ সিদ্ধিযুক্তঃ। সৎকার্য্য কর্ত্তা পরদারধর্য্যো নানা ধনোভুবি গুণানুরাগী।

হোরাফল।

শান্তঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ স্থিরমতির্নিত্যং সুহৃৎ পূজিতো নানারত্ন বরাঙ্গনাত্মজ-ধনৈর্যুক্ত সুবেশঃ শুচিঃ। ত্যাগী দেবগুরুদ্বির্জার্চ্চনরতঃ পাত্রং ধরিত্রীপতে-র্হোরায়াং রজনীকরস্য ভবেচ্ছত্যাপ্রিয়ো মানবঃ।

দ্রেক্কানফল।

দ্রেক্কানেঽমরপূজিতস্য সুতনুর্দীর্ঘায়ুরর্থান্বিতঃ সদ্বুদ্ধিঃ প্রিয়ভাষণোগুণ-নিধির্যুক্তযশো ধার্ম্মিকঃ। মোক্ষজ্ঞানপরঃ কৃপাময়তনুঃ শান্ত সুশীলঃ শুচিঃ।

ইত্যোম্।

সমাপ্ত।